আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মহব্বত-ভালোবাসার স্তরবিন্যাস

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

২৪ জুন ২০২২ তারিখে খিলগাঁওস্থ জুমু'আর মসজিদে প্রদত্ত বয়ান

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد: قال الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وقال رسول الله ﷺ: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.

কয়েক সপ্তাহ আগে বলেছিলাম, যিলহজ্জ মাসকেন্দ্রিক ইবাদত যথা হজ্জ, কুরবানী প্রভৃতি নিয়ে পর্যায়ক্রমে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে। কিন্তু ইতোমধ্যে একটা হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, যার কারণে আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বাস্তবেই এটা এমন এক দুর্ঘটনা যার প্রেক্ষিতে মুসলমানদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ এখনও বন্ধ হয়নি। আমাদের কলিজার টুকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এমন সব জঘন্য মন্তব্য করা হয়েছে, যেগুলো শোনার পর কোন মুসলমান কিছুতেই নীরব থাকতে পারে না। তাদের অভিযোগ, নবীজী নাকি কামুক বা যৌনকাতর ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ তিনি সংসার-জীবন শুরুই করেছেন নিজের চেয়ে পনেরো বছরের বড় চল্লিশোর্ধ একজন বয়স্কা নারীকে নিয়ে। অতঃপর জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ যৌবনের পুরোটাই তাকে নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। হযরত খাদীজা রাযি.-এর জীবদ্দশায় নবীজী আর কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি। অবশ্য হযরত খাদীজার ইন্তেকালের পর নবীজী আরও দশজন স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। সেটাও ছিল আল্লাহর নির্দেশে, ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের খাতিরে। এখানে লালসা চরিতার্থের ছিটেফোঁটাও ছিল না। থাকলে সে যুগের কাফের-মুশরিক যারা সর্বদা নবীজীর ত্রুটি অন্বেষণে লেগে থাকতো, অবশ্যই এ ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা করতো। তারা নবীজীকে পাগল বলেছে, কবি বলেছে, যাদুকর বলেছে কিন্তু চরিত্র নিয়ে সমালোচনাযোগ্য একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। বরং নবীজীর ব্যক্তিচরিত্র নিয়ে তারা ছিল প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তো এমন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মাহমান্য ব্যক্তি সম্পর্কে এমন জঘন্য মন্তব্য করা যে কোন আইনেই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

নরকের এই কীটগুলো আম্মাজান আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ নিয়েও নবীজী সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছে। প্রশ্ন হলো, নবীজীর সঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ কি নবীজীর আগ্রহ ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে হয়েছিল? না, বরং হযরত আয়েশার পিতা হযরত আবূ বকর রাযি.-এর একান্ত আগ্রহ ও প্রস্তাবে সংঘটিত হয়েছিল। তাহলে কনের পিতা হযরত আবূ বকর রাযি. কি নিজ সন্তানের বয়সস্বল্পতার বিষয়টি জানতেন না? অবশ্যই জানতেন। তা-সত্ত্বেও যখন তিনি বিবাহ দিয়েছেন অবশ্যই ভালো মনে করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা রাযি. হলেন দ্বিতীয় সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী। তার বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে আমরা নবীজীর সংসার জীবনের খুঁটিনাটি সব বিষয়ে অবগতি লাভ করি। এমন একটি হাদীসও কি দেখানো যাবে, যেখানে হযরত আয়েশা রাযি. নবীজীর সঙ্গে তার অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া নিয়ে অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন কিংবা কোন অভিযোগ তুলেছেন? কিয়ামত পর্যন্তও কেউ দেখাতে পারবে না। বরং এমন শতাধিক হাদীস দেখানো যাবে, যেখানে নবীজীর সঙ্গে তার প্রেমপূর্ণ ও আনন্দঘন দাম্পত্যজীবনের বিবরণ বিদ্যমান। উপরন্তু নবীজীর তৎকালীন সবচেয়ে বড় শত্রুদল মুশরিক, মুনাফিক, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কেউ কি এই বিবাহ নিয়ে কোন সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছিল কিংবা উচ্চবাচ্য করেছিল? একেবারেই না। তাহলে স্বয়ং কনে, কনের পিতা এবং কনের সমাজ যখন এ ব্যাপারে কোনও রকম আপত্তি তোলেনি এবং কাজটিকে সমালোচনাযোগ্যই মনে করেনি তখন বর্তমানের এই কুলাঙ্গাররা কোন যুক্তিতে আপত্তি ওঠায়?!

কথা আরো আছে, আমরা সাধারণত ভ্রান্ত-ধর্মের পূজনীয় ব্যক্তিবর্গের দোষ-ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করি না। নচেৎ তাদেরই গ্রন্থ থেকে দেখানো যাবে যে, তাদের অনেক পূজনীয় ব্যক্তি হেসে-খেলে শত শত নারীর ইজ্জত বিনষ্ট করেছে। এ প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য হলো, 'এগুলোকে সাধারণ চোখে দেখা যাবে না; এগুলো হচ্ছে দেব-দেবীদের লীলাখেলা। কারণ এরা শত শত নারীর কুমারীত্ব হরণ করলেও এদের মনে কোন কু' ছিল না।' আশ্চর্য! এমন ধর্মের অনুসারীরাও আজ নবীজীকে নিয়ে অশ্রাব্য সব মন্তব্য করছে! আরে, আগে তো নিজের কাপড়টা সামলাও, তারপর না-হয় অপরকে কাপড় সামলানোর উপদেশ দেবে!

বাংলাদেশ তো মুসলমানদের দেশ। আয়তন বিচারে সারা বিশ্বে আলেম-উলামা এবং মসজিদ-মাদরাসা বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বে আর কোন দেশে এতো বেশি মসজিদ-মাদরাসা ও আলেম-উলামা নেই। এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নেয়ামত। কিন্তু আমাদের দেশের যারা হর্তকর্তা– দলমত নির্বিশেষে– এদের বেশির ভাগই প্রথমত ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করে। তারপর বিদেশ থেকে বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করে দেশে এসে নেতা বনে যায়। এরা যে সব দেশ থেকে পড়াশোনা করে আসে, নিজেদের ঈমান-আমল সেখানেই জমা রেখে আসে। হ্যাঁ, মদ আর শুকর খেয়ে এবং অনাচারের মধ্যে জীবন কাটিয়ে ঈমানটা সেখানেই জমা দিয়ে আসে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি সরকারী বা সরকার বিরোধী ওজনদার একজন নেতাও দেখাতে পারবেন না, যারা উল্লিখিত জঘন্য ঘটনার প্রেক্ষিতে নিজেদের ঈমানের পরিচয় দিয়েছে এবং প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে অপরাধীর শাস্তি দাবী করেছে। এদের অন্তর রাসূলের ইশক ও মহব্বত থেকে সম্পূর্ণ খালি। এই মহব্বত-শূন্যতাই তাদেরকে আজ নীরব-নিশ্চুপ করে রেখেছে! এ ধরনের মুনাফিকী আচরণ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নিছক ইবাদত সংঘটন কিংবা ইবাদতের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সৃষ্টি করেননি। ইবাদত-বন্দেগী করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য এটা যথাস্থানে ঠিক আছে। কিন্তু ইবাদতের দ্বারা উদ্দেশ্য কি নিছক ইবাদত পরিপালন? না, কারণ, ফেরেশতারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ইবাদতগোযার। সুতরাং ইবাদতের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করার দরকার ছিল না । তাছাড়া এই যে আমরা পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ি, এ সময়

আমাদের অন্তর ও মনোযোগ কোথায় থাকে? বাস্তবতা হলো, নামায তো পড়ি কিন্তু দিলটা নামাযে থাকে না; থাকে আরেক জায়গায়। আবার অনেক খুশু-খুযুওয়ালা নামাযীর নামাযের মাসআলা-মাসাইলই জানা থাকে না। আবার মাসাআলা জানা থাকলেও রিযিক হালাল থাকে না। এগুলো নামায কবুল হওয়ার প্রতিবন্ধক। সারকথা, মাসআলা-মাসাইল ও মনোযোগ বিবেচনায় আমাদের এসব ইবাদত-বন্দেগী উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়। আমাদেরকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমাদের আন্তরিক মহব্বত ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। কবি বলেন,

درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انساں کو،

ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے قروبیاں۔

'দর্‌দে দিল' মানে মহব্বত-ভালোবাসা। আমাদেরকে এই ভালোবাসার প্রকাশ ও প্রমাণ দেয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। নচেৎ ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য তো ফেরেশতাদের কমতি ছিল না।

বর্তমানে এই মহব্বত ও ভালোবাসার প্রমাণ দেয়ার একট বড় রকমের সুযোগ এসেছে। এমনিতে সারা জীবনই মহব্বত প্রদর্শনের সুযোগ থাকে এবং পদে পদে মহব্বত প্রকাশও করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ স্ত্রী-সন্তানেরা কোন একটা আব্দার বা দাবী জানাচ্ছে। কিন্তু সেই দাবীটা শরীয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যদি কারও অন্তরে আল্লাহ ও তার রাসূলের মহব্বত অধিক থাকে– যেমনটি আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন যে, (অর্থ:) 'যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে'–তাহলে তিনি আল্লাহ ও রাসূল তথা শরীয়তের দাবীকে প্রাধান্য দিবেন। আর স্ত্রী-সন্তানদের দাবীকে নাকচ করে দিয়ে তাদেরকে বোঝাবেন যে, দ্যাখো! আমার টাকা-পয়সা কিছুতেই আল্লাহ এবং তার রাসূলের নাফরমানীর কাজে ব্যবহৃত হবে না। এতো কষ্ট করে টাকা-পয়সা উপার্জন করলাম, এখন ভুল পথে ব্যয় করে কবরে কি গিয়ে শাস্তির সম্মুখীন হবো? তার চেয়ে তোমরা ভালো কিছু চাও, বৈধ কিছু চাও– দিতে প্রস্তুত আছি।

বলছিলাম, মহব্বত প্রকাশের এ ধরণের সুযোগ আমাদের জীবনে অহরহ আসতে থাকে। বয়ানের শুরুতে যে হাদীসটি পড়েছি সেখানেও একথা বলা হয়েছে যে, কাউকে মহব্বত করো তো আল্লাহর জন্যই করো, কারও সঙ্গে দুশমনী রাখো তো আল্লাহর জন্যই রাখো। এ কারণেই পৃথিবীতে যতো ভ্রষ্টতা ও ভণ্ডামী আছে এবং যতো ভ্রষ্ট ও ভণ্ড লোক আছে সবার সঙ্গে আমরা শত্রুতা পোষণ করি। এই শত্রুতা পোষণ দুনিয়াবী কোন স্বার্থকেন্দ্রিক নয়; বরং এই শত্রুতা আল্লাহর জন্য। কারণ মানুষকে গোমরাহ ও বে-ঈমান বানানোর অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। পারলে কাউকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসো; কিন্তু গোমরাহ করার অধিকার বিলকুল নেই। এজন্য আমরা এদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করি। অনুরূপভাবে ঐ হাদীসে আরও আছে– কাউকে কিছু দিবে তো আল্লাহর জন্য দাও, আবার কাউকে মানা করে দিবে তো আল্লাহর জন্য মানা করে দাও। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়।

মহব্বতের পাঁচটি স্তর–

এক. পরিচয়সূত্রে মহব্বত। অর্থাৎ কারও সঙ্গে পরিচয় হলে বা কারও পরিচিতি সম্পর্কে অবগত হলে তার সঙ্গে এক ধরনের মহব্বত সৃষ্টি হয়। কথার কথা, যাত্রাপথে পাশের আসনে বসা লোকটির সঙ্গে আর দশজন সহযাত্রীর মতো স্বাভাবিক আচরণ করা হয়। কিন্তু কোনভাবে যদি জানা যায় যে, লোকটি তার আত্মীয়, তাহলে আচরণের ধারাটাই পাল্টে যায়। চা-কফি, নাস্তা খাওয়ানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

দুই. যাকে মহব্বত করা হয় বারবার তার আলোচনা করা হয়। এটা মহব্বতের দ্বিতীয় স্তর। এই যে আমি কথায় কথায় 'আমার শায়েখ ও মুর্শিদ হারদূয়ীর হযরত রহ. বলেছেন' বাক্য আওড়ে থাকি, এটা তার সঙ্গে আমার মহব্বতের আলামত। শায়খের মহব্বত আমাকে এটা করতে বাধ্য করে।

তিন. খানা-পিনায় স্বাদ থাকে না। স্বাস্থ্য সুরক্ষার খোদায়ী হুকুম তামিলের খাতিরে সে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করে ঠিক, কিন্তু আগে যে লোভ ও আগ্রহ নিয়ে গ্রহণ করতো এখন সেটা সম্ভব হয় না।

চার. কোন ভালো জিনিস অর্জিত হলে নিজের কাছে রাখতে মনে চায় না; যার সঙ্গে মহব্বত-ভালোবাসা তার কাছে রাখতে মনে চায়।

পাঁচ. প্রিয়জনের সঙ্গে মোলাকাত ও সাক্ষাতের অদম্য আগ্রহ।

মহব্বতের এই স্তরগুলো অর্জন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নানা রকম ইবাদতের বিধান দিয়েছেন। একেক ইবাদতের মাধ্যমে মহব্বতের একেকটি স্তর অর্জিত হয়। যেমন–

(ক) কালিমার মাধ্যমে আল্লাহ ও তার রাসূলের সঙ্গে আমাদের প্রথম স্তরের মহব্বত সৃষ্টি হয়। কালিমা পাঠকারী যখন অনুধাবন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে একবিন্দু নাপাক পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং পানির মধ্যে কতো সুন্দর নকশা ও আকৃতি দান করেছেন, যেটা কোন সৃষ্টির পক্ষে কিছুতেই করা সম্ভব নয় তখন আল্লাহর সঙ্গে তার মহব্বতের বুনিয়াদ ও ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোভাবে চিনবে সে তাকে মহব্বত করতে বাধ্য হবে। সে লক্ষ্য করবে, তার সব কিছুই তো আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। বাহ্যিকভাবে অপর কেউ দিয়ে থাকলে সেটাও আল্লাহরই অবদান। দাতার দিলের মধ্যে দেওয়ার আবেদন সৃষ্টি করেছেন বলেই তো সে তাকে দিয়েছে। হজ্জের তালবিয়ার মধ্যেও একথার বিবরণ আছে। 'ইন্নাল হামদা ওয়াননি'আমাতা লাকা ওয়াল মুলক।' অর্থাৎ সকল সৃষ্টির সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। কেউ কারও ভালো গুণের প্রশংসা করলে পরোক্ষভাবে সেটা আল্লাহরই প্রশংসা। কেননা আল্লাহই তাকে এই গুণে গুণান্বিত করেছেন। এমনিভাবে আমরা প্রতিনিয়ত যতো নেয়ামত উপভোগ করি সেগুলোও আল্লাহ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে বাদশাহী এবং কর্তৃত্বও আল্লাহই দান করেন; কাউকে দান করেন জান্নাত দেওয়ার জন্য, আর কাউকে দেন জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য। কাউকে কর্তৃত্ব দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, সে আল্লাহর ওলী হয়ে গেছে। অনেকে মনে করে, অমুককে পছন্দ না করলে কি আল্লাহ তাকে ক্ষমতায় বসাতেন! আরে, ফেরাউনকেও তো আল্লাহই ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। তাহলে এটা কি ফেরাউনকে বেহেশতে দেওয়ার জন্য ছিল! কর্তৃত্ব পাওয়ার পর কেউ যদি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী দেশ চালায়, বোঝা যাবে, তাকে জান্নাত দেওয়ার জন্য কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে এমন কিছু কর্তৃত্ববান লোকও আছে, যাদের কাছে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের মঞ্জুরীর জন্য যাওয়া হলে জিজ্ঞেস করে– বাজেট কতো? বলা হয় দশ কোটি। বলে, আমার উন্নয়ন কোথায়? এটাকে বিশ কোটি বানিয়ে আনুন আর আমার জন্য দশ কোটি রেখে যান। এসব লোককে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে জাহান্নামে নিয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্য। কখনও আল্লাহ বা রাসূলকে বেইজ্জত করা হলে এদের মুখ দিয়ে তখন টু শব্দটিও বের হয় না।

এদের মাখামাখি আর দেন-দরবার হলো ইসলামের সবচেয়ে কট্টর দুশমন ইয়াহুদী ও হিন্দু-মুশরিকদের সঙ্গে। কুরআনের কারীমেও এ দু'-পক্ষের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা বিবৃত হয়েছে।

(খ) মহব্বতের দ্বিতীয় স্তর অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নামাযের ইবাদত দান করেছেন। নামাযে বারবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; আমার আল্লাহ সবচে বড়, আমার আল্লাহ সবচে বড় উচ্চারণ করা হয়। এর দ্বারা নামায আদায়কারী নিজের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু, গুরু-শিষ্য, দল-মত সব কিছুর উর্ধ্বে আল্লাহর বড়ত্বের স্বীকৃতি দেয়। এভাবে সে মহব্বতের দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়ে যায়।

(গ) মহব্বতের তৃতীয় স্তর ছিল খানা-পিনায় অনাগ্রহ। এই স্তর অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা রোযার বিধান দিয়েছেন। সারাদিন না খেয়ে থাকো, মহব্বত বৃদ্ধি পেতে পেতে তৃতীয় স্তরে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ।

(ঘ) চতুর্থ স্তরের মহব্বত অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা যাকাতের বিধান দিয়েছেন। দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে ধন-সম্পদ অর্জন করেছো– যাকাত-ফিতরা, দান-সদকার মাধ্যমে অকাতরে সেগুলো আল্লাহর কাছে পাঠাতে থাকো। দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে দান-খয়রাতে কোন মুনাফা নেই; লোকসানই লোকসান। কিন্তু দানের বিনিময়ে আল্লাহর ঘোষণাকৃত বেহিসাব প্রতিদান ও লাভ অর্জনের প্রতি সীমাহীন আস্থা থাকার কারণে দান করা হচ্ছে। এটা আল্লাহর প্রতি মহব্বতের আলামত।

পক্ষান্তরে কৃপণ লোকেরা দান করে না বিধায় তাদের আমলনামা দান-খয়রাত থেকে খালি থাকে। তাদের আমলনামা যেন দান-খয়রাত থেকে খালি না থাকে এজন্য আল্লাহ তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে মান্নত নামে দানের একটি খাত রেখেছেন। মান্নতের হাকীকত হলো আল্লাহর সঙ্গে চুক্তি করা। উদাহরণ স্বরূপ– 'আল্লাহ! ছেলেটা অসুস্থ। তাকে যদি সুস্থ করে দাও, আমিও মাদরাসায় একটা গরু দান করবো।'

এজন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাধারণত মান্নতের দিকে যায় না। সে এমনিতেই দান-খয়রাত করতে থাকে। কিন্তু ঐ যে কৃপণ সে-তো আর এমনিতে দান করবে না, এজন্য আল্লাহ তা'আলা কিছুটা বিপদে ফেলে তাকেও দানশীলদের কাতারে শামিল করে নেন। অনেক সময় দেখা যায়, অভাবগ্রস্ত লোকজন কারও কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। সে দিতে অস্বীকার করে, কিন্তু পরের দিনই আবেদনকারীকে ডেকে চাহিদার কয়েকগুণ বেশি দিয়ে দেয়। কী ব্যাপার? আর বলবেন না ভাই! ছেলেটার ক্যান্সার ধরা পড়েছে; দু'আ করবেন, আল্লাহ যেন সুস্থ করে দেয়! এভাবে কৃপণদেরকে আল্লাহ তা'আলা জবরদস্তি কিছু সাওয়াব দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

(ঙ) মহব্বতের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত স্তর হলো আল্লাহর দর্শন। কিন্তু পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় এবং দুনিয়াবী এই দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তো আল্লাহকে চাক্ষুষদর্শন সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তো আমরা দুপুরের সূর্যের দিকেই তাকিয়ে থাকতে পারি না; চোখ ঝলসে যায়। একবার হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে দেখার আব্দার জানিয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ পর্দার আড়াল থেকে আল্লাহ তা'আলা তার নূরের সামান্য ঝলক প্রকাশ করলেন। ব্যস, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মতো জালীলুল কদর নবীও বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তবে জান্নাতে আমাদের দৃষ্টিশক্তির উন্নয়ন ঘটবে। তখন আমরা আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখতে পাবো ইনশাআল্লাহ।

দুনিয়াতে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার দীদার সম্ভব নয়, এজন্য আল্লাহ তা'আলা এর বিকল্প হিসেবে বাইতুল্লাহর হজ্জের বিধান রেখেছেন। এই ঘরকে আল্লাহ নিজের ঘর বলে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে অবস্থান করেন। (নাউযুবিল্লাহ) অনেক মূর্খ লোক কিন্তু এমনটি মনে করে থাকে। এটা দীন সম্পর্কে আমাদের সীমাহীন উপেক্ষা ও উদাসীনতার বিষফল। অনেক পিতা-মাতা নাক-কান ফোটার আগেই সন্তানকে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দেয়। ফলে দীনের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কেও তারা সারাজীবন অজ্ঞ থেকে যায়। এদের একজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– বল তো আমাদের নবীর নাম কী? উত্তর দিল– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রশ্নকারী ধমক দিয়ে বলল, আরে, এমন একটা হিন্দুলোক কি করে নবী হয়? এবার সে বলল, সরি, ভুল হয়ে গেছে; আমাদের নবীর নাম হলো কাজী নজরুল ইসলাম। এই হলো আমাদের ছেলে-পেলেদের দীনী জ্ঞান যে, কবি আর নবীর পার্থক্য করতে পারে না!

আলোচনা চলছিল, নাম 'আল্লাহর ঘর' হলেও আল্লাহ এখানে থাকেন না। মূলত ঘরটিকে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানিত বোঝানোর জন্য আল্লাহর ঘর নাম দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে হজ্জ ও উমরার মাধ্যমে এই ঘরের চারপাশে চক্রাকারে প্রদক্ষিণের আদেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট দিনে মিনা, মুযদালিফা, আরাফায় অবস্থানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে এই স্থান-গুলোতে আল্লাহর পক্ষ হতে হাজীদেরকে মেহমানদারী করানো হয়। আল্লাহর মেহমানদারী দুনিয়াবী খানা-পিনা দিয়ে হয় না। আল্লাহর মেহমানদারী হয় জান্নাত প্রদানের মাধ্যমে। ইরশাদ হয়েছে–

نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ.

অর্থাৎ এই যে জান্নাত এটা গফূরুর রহীমের পক্ষ হতে মেহমানদারী। (সূরা হা-মীম সাজদাহ; আয়াত ৩২)

হজ্জে গমনেচ্ছুদের ব্যাপারে কিছু দিকনির্দেশনা

(ক) আপনাদের যে সকল আত্মীয়-স্বজন এ বছর হজ্জে যাচ্ছেন তাদেরকে বলবেন, তারা যেন হজ্জ থেকে দাড়িবিহীন ফেরৎ না আসে। হজ্জ থেকে দাড়িবিহীন ফিরে না আসাটা রাসূলের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসার দাবী। কারণ কোন দাড়িবিহীন লোক যখন রাসূলের দরবারে গিয়ে সালাম দেয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দেন না। শুধু তা-ই নয়, তিনি তার থেকে চেহারা ঘুরিয়ে নেন। এক বর্ণনায় এসেছে, একবার পারস্য থেকে দু'জন দাড়িবিহীন লোক নবীজীর দরবারে এসেছিল। নবীজী তাদের থেকে নিজের চেহারা ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এদেরকে এমন কাজ করতে কে আদেশ দিয়েছে? তারা বলল, আমাদের মুনীব আমাদেরকে এই আদেশ দিয়েছে। উত্তরে নবীজী বললেন, কিন্তু আমার মুনীব আল্লাহ তো আমাকে দাড়িগুলো তার গতিতে ছেড়ে দিতে এবং মোঁচ খাটো করতে নির্দেশ দিয়েছেন!

দেখুন, বাংলাদেশে থেকে দাড়ি কাটা অবশ্যই গোনাহের কাজ। কিন্তু আল্লাহর শাহী দরবারে, তার রাসূলের আরামগাহে গিয়ে দাড়ি কাটা তার চেয়ে লক্ষ-কোটি গুণ বেশি গোনাহের কাজ। উদাহরণ স্বরূপ, কোন মন্ত্রী-মিনিস্টারকে দেশের কোন এক প্রান্তে অবস্থান করে গালাগালি করা আর স্বয়ং মন্ত্রীর সামনে গিয়ে গালাগালি করা এক নয়। অনুরূপ হজ্জে গিয়ে গোনাহ করলে গোনাহের পজিশন লক্ষগুণ ভারি হয়ে যায়, ঠিক যেমন নেকির কাজ করলে তার পজিশনও লক্ষগুণ বেড়ে যায়। এজন্য পুরুষ লোক যেন হজ্জের পর অবশ্যই দাড়িসহ দেশে আসে।

(খ) অনেক মহিলা আল্লাহ মালুম কার কাছে শুনেছে যে, হজ্জে গেলে নাকি চেহারা খোলা রাখতে হয়। এজন্য সে হজ্জের সফরে চেহারা খোলা রাখে এবং ফিরে আসার পরও এটাকে আর গুরুত্ব দেয় না। আল্লাহর পানাহ! এরা এক ফরয আদায় করতে গিয়ে আরেক ফরয বিসর্জন দিয়ে আসে। মাসআলা হলো, ইহরাম অবস্থায় মহিলারা নেকাবটাকে চেহারার উপর দিয়ে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিবে যেন নেকাবটা চেহারার চামড়ায় লেগে না থাকে। অর্থাৎ সামনের দিকে বর্ধিত ক্যাপজাতীয় কিছু মাথায় পরিধান করে তার উপর দিয়ে নেকাব ঝুলিয়ে দিবে। এতে নেকাবও চেহারার চামড়ায় লেগে থাকবে না আবার পর্দার বিধানও লঙ্ঘিত হবে না। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই কথাটাকে 'হজ্জের সময় মহিলাদের চেহারা ঢাকা যাবে না' মর্মে বুঝে নিয়েছে। এর ফলে পর্দানশীন বহু মা-বোন হজ্জে গিয়ে সারা জীবনের পর্দা খুঁইয়ে আসছে।

(গ) অনেক মহিলা হাজী প্রতি ওয়াক্তেই নামায আদায় করতে হারাম শরীফে কিংবা মসজিদে নববীতে গমন করেন। এটাও ভুল পন্থা। মহিলাদের জন্য হজ্জের সফরেও হারাম শরীফে কিংবা মসজিদে নববীতে নামায আদায় করার চেয়ে হোটেলে নিজ কক্ষে নামায আদায় করা বহুগুণে উত্তম। তারা হোটেল কক্ষে নামায আদায় করেই বাইতুল্লাহর লক্ষ রাকাতের সাওয়াব পাবেন, উপরন্তু উত্তম পদ্ধতিতে আদায়ের কারণে আরও কয়েকগুণ বেশি সাওয়াব পাবেন। হ্যাঁ, কখনও তাওয়াফ বা সায়ীর উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহয় যাওয়ার পর যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে তারা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নামায আদায় করে নিবেন। শুধু নামায আদায়ের জন্য বাইতুল্লাহয় বা মসজিদে নববীতে গমন করা মহিলাদের জন্য কিছুতেই সমীচীন নয়।

(ঘ) হাজী সাহেবগণ সতর্কতার সঙ্গে মোবাইলচর্চা থেকে বিরত থাকবেন। বিশেষত ছবি বা সেলফি তোলা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রাখবেন। হজ্জের সফরে প্রাণীর ছবি তোলার গোনাহে লিপ্ত হলে হজ্জ কবুল না হওয়ার মারাত্মক আশংকা থেকে যায়। এতো এতো টাকা খরচ করে এবং এতো এতো কষ্ট করে যদি ছবি তোলার কারণে হজ্জ বাতিল হয়ে যায়– এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছুই নেই।

(ঙ) হাজী সাহেবান হজ্জের সফরে হালাল খানা-খাদ্যের প্রতি যত্নবান থাকবেন। আজকাল বাইতুল্লাহর আশপাশেও হারাম খাদ্যের উপস্থিতি বিদ্যমান। উদাহরণত কেএফসির খাবার-দাবার। আমাদের জানা মতে, প্রতিষ্ঠানটি ইয়াহুদী মালিকানাধীন। এদের সরবরাহকৃত খাদ্য হারাম হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এজন্য হাজী সাহেবান এসব খাদ্যগ্রহণ থেকে সতর্কতার সঙ্গে বেঁচে থাকবেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আ-মীন।

(২৫ পৃষ্ঠার পর; বালা-মুসীবতের কারণ)

এতো এতো দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সম্মুখীন হয়েও আমরা কয়টি গোনাহ বর্জন করতে পেরেছি এবং নেকীর কাজে আমাদের যে সীমাহীন গাফলতি তার কতোটুকু ক্ষতিপূরণ করতে পেরেছি। যদি আমরা তা না করে থাকি তাহলে এই ধারাবাহিক মুসীবত ও দুর্যোগ থেকে কিভাবে মুক্তির আশা করতে পারি! কেউ বিষ পান ছাড়বে না আবার বেঁচে থাকারও আশা করবে, এটা কি করে সম্ভব! গোনাহ ও আল্লাহর নাফরমানী তো বিষতুল্য। ধ্বংস ও বরবাদী এর অনিবার্য পরিণতি। এই ধ্বংস ও বরবাদী থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইলে নিজেদেরকেই উদ্যোগ নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

অর্থ: জেনে রেখো, আল্লাহ কোনও জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (সূরা রা'দ-১১)

এজন্য আযাব-গযব থেকে বাঁচতে হলে হিম্মত করে গোনাহ ছেড়ে দেয়া এবং হিম্মত করে নেকীর কাজ শুরু করে দেয়া আমাদের প্রধান কর্তব্য। তবে মুহূর্তেই সব গোনাহ ছেড়ে দেয়া এবং সকল নেককাজ সম্পন্ন করে ফেলা অতো সহজ নয়। এ ক্ষেত্রে মরদুদ শয়তান, পাশবিক চাহিদা, দূষিত পরিবেশ এবং জেঁকে বসা বদঅভ্যাস আমাদের প্রধান শত্রু হয়ে দেখা দেয়। এজন্য বুযুর্গানে দীন আমাদেরকে বিশেষ ধারাক্রম অনুসরণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা বলেছেন, তিনটি গোনাহ এরূপ রয়েছে যেগুলো ছাড়তে পারলে অন্যান্য গোনাহ ছেড়ে দেয়া সহজ হয়। ১. বদ নেগাহী-কুদৃষ্টি। ২. বদ যুবানী-কুকথা। বদ গোমানী-কুধারণা। তাঁরা আরও বলেছেন, তিনটি নেককাজ এমন রয়েছে, যেগুলোর উপর আমল করতে পারলে অন্যান্য নেকীর কাজ সহজ ও আসান হয়ে যায়। ১. সালামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার। ২. উন্নত কাজে ও উন্নত স্থানে ডানদিককে প্রাধান্য দেওয়া, নিম্নমানের কাজে ও নিম্নমানের স্থানে বামদিককে প্রাধান্য দেওয়া। ৩. বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা।

হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী রহ. বালা-মুসীবত চলাকালীন আমাদেরকে বিশেষভাবে তিনটি কাজে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ১. ইলম তথা দীনী জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ। ২. আল্লাহ তা'আলার প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা বৃদ্ধির পন্থা জেনে তা বাস্তবায়ন। ৩. অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় সৃষ্টির উপায় জেনে খোদাভীতি অর্জন।

জনসাধারণের জন্য ইলম অর্জনের সহজ পন্থা হলো– (ক) জুমু'আর দিন আগেভাগে মসজিদে গিয়ে এবং হক্কানী উলামায়ে কেরামের দীনী মজলিসগুলোতে শরীক হয়ে মনোযোগ দিয়ে দীনী কথা শ্রবণ করা। (খ) হক্কানী উলামায়ে কেরাম লিখিত নির্ভরযোগ্য দীনী কিতাব অধ্যয়ন করা। (গ) দাওয়াত-তাবলীগের মেহনতে বের হয়ে পারস্পরিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করা।

আল্লাহর প্রতি মহব্বত বৃদ্ধির পন্থা হলো– (ক) আল্লাহর নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করে শোকরগোজার হওয়ার চেষ্টা করা। (খ) দৈনিক কমপক্ষে ১০০ বার কালিমা তাইয়িবা পাঠ করা, ১০০ বার ইস্তিগফার করা এবং ১০০ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করা। (গ) যে কোন নেকীর কাজ করার সময় এর মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে মহব্বত বৃদ্ধির নিয়ত করা। (গ) কোন নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ সীরাতগ্রন্থ পাঠ করা। (ঙ) কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের নিয়মতান্ত্রিক সান্নিধ্য অবলম্বন করে নিজেকে সংশোধন করতে থাকা।

অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার উপায় হলো– (ক) বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। (খ) আল্লাহর জেলখানা জাহান্নাম ও তার শাস্তির কথা চিন্তা করা। (গ) কোন খোদাভীরু বুযুর্গের সান্নিধ্য অবলম্বন করে তার দেয়া ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করতে থাকা।

উল্লিখিত পন্থায় ইলমে দীন হাসিল, আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি, খোদাভীতি অর্জন এককথায় গোনাহ বর্জন ও নেকী অর্জনের পাশাপাশি দুর্দশাগ্রস্ত ও দুর্যোগকবলিত মানুষের সেবায় সাধ্য অনুযায়ী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়াও বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার অন্যতম উপায়। আল্লাহ তা'আলা আমল করার তাওফীক নসীব করুন। আ-মীন।

লেখক: সিনিয়র মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।
খতীব: লেকসার্কাস জামে মসজিদ, কলাবাগান, ঢাকা।

নারী প্রসঙ্গে আমার কথা

শাইখুল ইসলাম মুস্তাফা ছাবরী রহ.

শাইখুল ইসলাম মুস্তাফা ছাবরী (১২৮৬-১৩৭৩ হি., ১৮৬৯-১৯৫৪ খ্রি.) বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ও সুপ্রসিদ্ধ আলেমে দীন। তুরস্কেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা। পড়াশোনার ধাপ পার করে মাত্র ২২ বছর বয়সে ইস্তাম্বুলের জামে' মুহাম্মাদ আল-ফাতিহে শিক্ষকতা শুরু করেন। একপর্যায়ে তুরস্কের শাইখুল ইসলাম পদে বরিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কামাল পাশার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেন। পরবর্তীকালে হিজরত করে সপরিবারে মিসরে পাড়ি জমান। সমকালীন তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিভ্রান্তির খণ্ডন করে শেষজীবনে রচিত 'মাউকিফুল আকল ওয়াল ইলম ওয়াল আমাল' তার অমর কীর্তি। এছাড়াও রয়েছে তার বিভিন্ন রচনা, যা বরাবরই জ্ঞানবোদ্ধাদের খোরাক হয়ে এসেছে। বক্ষ্যমান পুস্তিকাটি আধুনিক পশ্চিমা-নারীবাদ খণ্ডনে তার অসাধারণ কিছু চিন্তাগাথা। এটি তিনি নারীবাদ ও পাশ্চাত্যবাদের আগ্রাসনের অন্যতম প্রবেশপথ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার মুসলিম নামধারী নারীবাদীদের খণ্ডন করে লিখেছেন। প্রবন্ধ দুটি প্রথমে মিসরের আল-ফাতাহ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর দুটি প্রবন্ধকে একত্র করে পুস্তিকা আকারে কায়রোর মাতবা'আ সালাফিয়্যা থেকে ১৪৫৪ হি.-১৯৩৫ খ্রি.-এ প্রকাশিত হয়। আদর্শিক বলিষ্ঠতার সঙ্গে বক্তব্যের জোর ও যুক্তির ধার বিবেচনায় আজকের দিনেও প্রবন্ধ দুটি সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিধায় রাবেতার পাঠক সমীপে এর অনুবাদ প্রকাশ করা হলো।

(পাশ্চাত্যের অনুসারীদের বক্তব্যগুলোর স্বরূপ)

ভূমিকা:

সকল প্রশংসা পুরো সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর প্রতি।

সমাজে নারী প্রসঙ্গটি ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং ইসলাম ও অন্যান্য আদর্শের মাঝে সবচে' বড় পার্থক্য-নির্ণয়ক। কিছুকাল আগেও কল্পনা করা যেতো না যে, পাশ্চাত্য নিজেদের বস্ত্রবিমুখ নারীদের মতো মুসলিম-প্রাচ্যেও তাদের কোনো অনুসারী খুঁজে পাবে। কেননা মুসলিম-প্রাচ্য অন্যান্য বিষয়ে পাশ্চাত্যের যতই অনুকরণ করুক, আপন নারীদের ব্যাপারে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রবাদতুল্য। আফসোস, ইসলামের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দেওয়ার পাশাপাশি মুসলিম-প্রাচ্য আজ আপন নারীদের ব্যাপারেও জাত্যাভিমান খুঁইয়ে বসেছে। হয়তো প্রথমটি বিসর্জন দেয়ার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয়টিও উঠিয়ে নিয়েছেন।

লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্যের ভাবভঙ্গি ও অভিব্যক্তি দেখে মনে হবে, তারা বুঝি নারীদের পূজো করে এবং তাদেরকে দেবীর মর্যাদা প্রদান করে; অপর দিকে প্রাচ্যের নারীরা যেন যারপরনাই বিপর্যস্ত ও ভাগ্যাহত! বাস্তবতা হলো, পাশ্চাত্য ও তাদের অনুসারীরা নারীদের পূজনীয় বানানোর নাম করে নিজেদের জৈবিক লালসা চরিতার্থ করার ধান্ধা করছে। আধুনিক পুরুষেরা নারীকে যে সম্মান ও অগ্রাধিকার দেয় এর দ্বারা তাদের মতলব থাকে নারীর ঠোঁটে ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্রয়ের হাসি ফোটানো। তারা মূলত নারীকে ধোঁকা দিয়ে তামাশা ও বিনোদনের উপকরণ বানাতে চায়। অনুরূপভাবে নারীকে পর্দা ও ঘর থেকে বের করে আনার অর্থ হলো, নারীকে তার সুরক্ষিত সিংহাসন থেকে বাজারী-পণ্যে পরিণত করা। এমনকি নারীদের পুরুষালী কাজে অংশগ্রহণ– যাকে আজকাল নারীমুক্তি ও নারীঅধিকার শব্দে ব্যক্ত করা হয় এবং যাকে বিচারবুদ্ধিহীন নারীরা পুরুষদের সমকক্ষতা অর্জন জ্ঞান করে– এটা নারী কর্তৃক জীবনের সেই নির্মম জোয়াল কাঁধে তুলে নেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, যে জোয়াল প্রাচ্যের পুরুষেরাই এখনো ঠিকমত বহন করতে পারেনি। উপরন্তু এই জোয়াল ও বোঝা তুলে নেওয়া হচ্ছে পুরুষের সহযোগী হয়ে নয় বরং পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতার উদগ্র বাসনায়। সে ক্ষেত্রে কোন নারী যদি এই প্রতিযোগিতায় হেরে না যায় তবে তা শুধু এই কারণে যে, সংশ্লিষ্ট পুরুষ তাকে ছাড় দিয়েছে তার নারিত্ব থেকে সুবিধাভোগের বিনিময়ে। আর এটা নারীর জন্য সম্মান নয় সুস্পষ্ট অপমান। অথচ প্রাচ্যের নারীরা ছিল পুরুষের শ্রেষ্ঠ সহযোগী; তারা ঘরে অবস্থান করেই পুরুষকে সহযোগিতা করতো এবং জীবনসংগ্রামে পুরুষকে সঙ্গ দিতো। পরিবারে নারীরা থাকতো পরম সম্মানিত মা কিংবা সংসার-সম্রাজ্ঞী স্ত্রী হয়ে।

এই পুস্তকে আমরা মূলত প্রাচ্যের মুসলিম নারী এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার নিয়ে আলাপ করতে চাই। সুতরাং কতক ভাগ্যাহত মুসলিম নারী যারা অত্যাচারী ও কঠোরস্বভাব স্বামীদের দ্বারা বিপর্যস্ত তাদের প্রসঙ্গ টেনে আমাদের উপর আপত্তি করার সুযোগ নেই। বিপর্যস্ত নারীদের এসব সমস্যা ইসলামী সভ্যতা ও আইন-কানুনের আলোকে সমাধান করা জরুরী। ইসলামী শরীয়ত এ সকল জালেমদের উচিত শিক্ষা দিতে অক্ষম নয়, চাই তারা যেমনই হোক না কেন!

অতএব শারীরিক শক্তিমত্তায় পুরুষের চেয়ে দুর্বল নারীটি– (দুর্বলতার বিষয়টি স্বীকার করেছেন দার্শনিক প্লেটো তার 'নারী-পুরুষের সমতা' সংক্রান্ত আলোচনায়। এ যুগের নারীবাদীরাও প্লেটোর সেই সনাতন বক্তব্য আঁকড়ে রেখেছে। এর বিশদ বিবরণ সামনে 'পর্দা ও পর্দাহীনতা' শিরোনামে আসছে।) –যদি ঘরের ভেতরেই পুরুষের সঙ্গী ও সহযোগী হয়ে নির্যাতিত হয়– (যেমনটি প্রাচ্যের নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়)– তাহলে তো জীবন ও জীবিকার নানামুখী

কাজে পুরুষের প্রতিযোগী হতে গেলে নারীর নির্যাতিত ও বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা আরও বেশী। এভাবে নারীদের জন্য পুরুষদের বিনোদনসামগ্রী হওয়া ছাড়া জুলুম-নির্যাতনমুক্ত নিরেট কোনো স্বাধীন জায়গা আর বাকি থাকছে না। সুতরাং যারা প্রাচ্যের নারীদের জন্য পশ্চিমা নারীদের অনুরূপ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করে, তারা নারী কর্তৃক পুরুষদের প্রতিযোগী হওয়ার ক্ষেত্রটিকে নারীর জন্য অপমানকর শেষ ক্ষেত্র তথা বিনোদনসামগ্রী হওয়া-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। ফলে দিনশেষে নারীদের জন্য জুলুমমুক্তির দাবীটি নারীদের একান্ত ক্ষেত্রটিতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় (অর্থাৎ পুরুষদের বিনোদনসমাগ্রী হওয়ার ক্ষেত্র, যেখানে পুরুষদের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা করতে হয় না)। অনুরূপভাবে পর্দামুক্তির আন্দোলনকারীরা নারীদেরকে যে মর্যাদা দিচ্ছে তার শেষকথা হলো, ঐ সকল পরপুরুষ যারা নারীটিকে লালসার চোখে দর্শন করে এবং তার সঙ্গে ওঠাবসা করে তারা নারীটিকে একান্তে পেতে তার স্বামীর প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দী হয়ে যাচ্ছে। (এই না-হলে আর মর্যাদা!)

আমরা মনে করি, যেহেতু নারীর শারীরিক দুর্বলতার বিষয়টি প্রতিপক্ষের কাছেও স্বীকৃত, উপরন্তু নারীর প্রতি পুরুষের সহজাত আকর্ষণ, পুরুষের প্রতি নারীর মুখাপেক্ষিতা এবং নারী-পুরুষের সংমিশ্রণের চিহ্ন নারীর মধ্যে থেকে যাওয়া– এই সব ক'টি ব্যাপার নারীদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় জীবন যাপনের প্রতিবন্ধক। এ ব্যাপারগুলোই ফায়সালা করে দেয় যে, নারীরা এককভাবে জীবন যাপন করতে পারে না, নারীদের ব্যাপকহারে পুরুষদের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার সুযোগ নেই, সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা একজন পুরুষেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং এই সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমস্যা তৈরি করে এমন সকল বিষয় তারা পরিহার করে চলবে।

এতক্ষণ যা বলা হলো, এটাই পুস্তিকার প্রধান দুই শিরোনাম– ১. বহুবিবাহের মূলনীতি, ২. পর্দা ও পর্দাহীনতা– প্রসঙ্গে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার। এই দু'টো বিষয়কে কেন্দ্র করেই নিম্নলিখিত দুই দলের মধ্যে যতো বিতর্ক ও কোন্দল। একদল হলো, যারা প্রাণপণ করে নিজেদের ধর্ম ও ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকতে চায়। অপর দলটি হলো, যাদের দেহ তো প্রাচ্যের শ্বাস নিচ্ছে কিন্তু মন পড়ে আছে পাশ্চাত্যের নর্দমায়। আলোচনা দু'টি পাঠ করার পর পাঠক অনুধাবন করতে পারবেন, আকল-নকল তথা বিবেক-বুদ্ধি ও ঐতিহ্যগত বিবরণ এবং আত্মমর্যাদাবোধ ও জাত্যাভিমান এর প্রতিটিই প্রথম দলকে সুসমর্থন করছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলের চোখের উপর লেপ্টে আছে প্রবৃত্তির আবরণ, গলায় সেঁটে আছে আনুগত্যের বেড়ি, যে আনুগত্যের সারকথা হলো– 'আমরা আমাদের আদর্শ ও কেন্দ্র পশ্চিমাদেরকে একটা পন্থার উপর পেয়েছি, আর আমরা তাদের পদচিহ্নে নিজেদের পথ খুঁজে পাই।'

অতএব ব্যাপারটি মোটেই এই নয় যে, প্রথম দলটি দলীল, বিবেচনা ও গবেষণাবিমুখ নিছক পূর্বসূরীদের অনুকরণকারী এবং একথার প্রবক্তা যে, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটি পন্থার উপর পেয়েছি...' আর দ্বিতীয় দলটি দলীল, বিবেচনা এবং গবেষণার পথ অনুসরণকারী। হ্যাঁ, প্রথম দলটি যদি নিছক বাপ-দাদাদের অনুসরণের কথা বলতো-ও, তবু তাতে সমস্যা ছিল না; কারণ বাপ-দাদার অনুসরণ ভিন্‌জাতীর অনুসরণের চেয়ে শুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দল কর্তৃক ভিন্‌জাতীর অনুসরণ হলো নিরেট অন্ধ-অনুকরণ। অথচ প্রথম দল কর্তৃক বাপ-দাদাদের অনুসরণে বিবেক ও মর্যাদাবোধের সুসমর্থন রয়েছে।

–মুস্তাফা ছাবরী
সাবেক শাইখুল ইসলাম, উসমানী সালতানাত

প্রথম প্রসঙ্গ: বহুবিবাহের মূলনীতি

জানা কথা যে, নারীপ্রসঙ্গ আধুনিক যুগে গুরুতর সামাজিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে মোটাদাগে পার্থক্য টেনে দেয়। বহুবিবাহ প্রসঙ্গটি এমন, যা দিয়ে ইসলামকে ঘায়েল করার প্রথম সুযোগটি গ্রহণ করা হয়। ভাবখানা এমন যে, এটি ইসলামের সবচে প্রসিদ্ধ দুর্বল দিক। পশ্চিমা ও তাদের চশমা ধারণকারী মুসলমানেরা এ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকে। এই চশমা-পরা মুসলমানেরা যদি কদাচিৎ এই বিষয়ে ইসলামী বিধানের পক্ষে অজুহাত দিতে চায় তাহলে বড়জোর এটুকু বলতে হিম্মত পায় যে, বহুবিবাহ ইসলামে বাধ্যতামূলক কিছু নয় এবং তার বৈধতা এমন সব শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ যে, কার্যত তা অসম্ভব। কিন্তু তারা এটা ভুলে যায় যে, মৌলিকভাবে বহুবিবাহের বৈধতা স্বীকার করা মুসলমানের জন্য জরুরী, আর এর শর্তগুলো একে অসম্ভব করে তোলে না। যদি তাই হয় তবে শরীয়ত কর্তৃক একে বৈধ সাব্যস্ত করাটা অর্থহীন ও ফালতু কাজ হয়ে যায়। এমনিভাবে যে সকল সাহাবায়ে কেরাম এই শরয়ী বৈধতার উপর আমল করেছেন তাদের এই কাজকে অসম্ভবের পেছনে ছোটা গণ্য করতে হয়।

এ বিষয়ে আমি তেরো বছর পূর্বে তুর্কি ভাষায় লিখিত আমার কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু ইদানিং কিছু লেখক পত্রিকার পাতায় নতুনভাবে এ বিষয়ে গবেষণা ও ভাবনা প্রকাশ করছেন। ফলে এ বিষয়ে আমি আমার বক্তব্য তুলে ধরার ইচ্ছা করেছি।

বিয়ে-শাদী বিষয়ে ইসলামের মাকসাদ বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, বংশ রক্ষা এবং মানুষের মাঝে প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান জৈবিক চাহিদা বৈধ পন্থায় পূরণ করা। কোনো ধর্ম বা সভ্য আইন বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে এই দুই উদ্দেশ্যের ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য রাখে না। অতএব বোঝা গেলো, ধর্ম ও বিবেক উভয়টি একমত যে, জৈবিক আকর্ষণ পূরণের ক্ষেত্রে অবৈধ পন্থার পরিবর্তে বৈধ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আর যখন কোন পুরুষ কোনো নারীর অন্তরঙ্গ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করে, তখন তাকে অবশ্যই যুক্তি ও বর্ণনার আলোকে বৈধ পন্থা তথা বিবাহের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আর যতক্ষণ পৃথিবীতে এমন মানুষ থাকছে যার একজন স্ত্রী যথেষ্ট হচ্ছে না; সে তার চোখ দিয়ে এবং পা দিয়ে (ঘুরে ঘুরে) আরো নারীকে সন্ধান করে ততক্ষণ বহুবিবাহকে মৌলিকভাবে স্বীকার করা আবশ্যক। তবে সে ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে কিনা যুক্তি ও বর্ণনার দাবী থেকে বিচ্যুত হয় এবং ব্যভিচারকে বৈধ সাব্যস্ত করে। অথবা যে

কিনা বাস্তবতা থেকে চোখ বুজে থাকে এবং পৃথিবীতে বিবাহিতদের মাঝে ব্যভিচারীদের বিদ্যমানতাকে অস্বীকার করে, কিংবা যার বিবেক এই বিষয়টি অনুধাবনে অক্ষম যে, বহুবিবাহকে নাকচ করা কিছু পুরুষের জন্য ব্যভিচারকে বৈধতা দেওয়ার নামান্তর।

উপরে যা বললাম এটুকুই মৌলিকভাবে বহুবিবাহের প্রবক্তাদের দলীলকে অগ্রাধিকারদান এবং এর বিরোধিতাকারীদের দলীলের অগ্রহণযোগ্যতা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশি তর্ক-বিতর্কের দরকার থাকে না। আমি যুক্তি-পাল্টাযুক্তির এই ধারায় বিবাহ এবং ব্যভিচারকে তুলনা করে আমার পক্ষে যুক্তি দিয়ে যাব। আর যারা প্রবৃত্তির তাড়নায় শরীয়তে নিষিদ্ধ পন্থায় নারীকে ভোগ করতে চায়– চাই সহবাসের মাধ্যমে হোক কিংবা চুম্বনের মাধ্যমে হোক বা আলিঙ্গন করে হোক অথবা দৃষ্টিপাত করে হোক– শুধু তাদের প্রতি লক্ষ্য করে আমি বহুবিবাহকে প্রাধান্য দিব। আর বহুবিবাহের সমর্থক ও বিরোধীদের মাঝে বিশেষ করে এই ইজ্জত-লুটেরাদের দিয়েই যুক্তি হাজির করবো।

ইসলাম হলো পবিত্র। ইসলাম পুরুষ ও নারীদের মাঝে শরীয়তসম্মত সম্বন্ধ স্থাপন ছাড়া ভোগ-ব্যবহারের অনুমোদন দেয় না। যখন পুরুষের কোন নারীর প্রয়োজন হবে তখন তাকে সদর দরজা দিয়ে আসতে হবে এবং সুসাব্যস্ত সম্বন্ধের মাধ্যম গ্রহণ করতে হবে। যেন শরীয়ত ও মানুষজন জেনে যায় যে, এই নারী এই পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী। ইসলাম নারীপুরুষের সম্পর্ককে চৌর্যবৃত্তিতে পরিণত করার অনুমতি দেয় না। ইসলাম নারীদেরকে শিকারী পুরুষদের শিকার আর পাপাচারীদের খেলনা বানাতে চায় না। 'দ্বিতীয় স্ত্রী'! হ্যাঁ, যারা সামাজিক বোধ ও শিষ্টাচারকে পশ্চিমা বোধ ও শিষ্টাচার দ্বারা বদলে নিয়েছে, যারা হিদায়াতের বদলে ভ্রষ্টতা গ্রহণ করেছে, তাদের মুখে এই শব্দটি ভারী বটে! হায়! তারা যদি এই শব্দকে 'ব্যভিচারিণী' শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতো এবং উপলব্ধি করতো! অবশ্য তারা লজ্জা ও অপমান লুকানোর জন্য 'ব্যভিচারিণী'র নাম দিয়েছে প্রেমিকা! অথচ শরীয়ত বা আইন কথিত এই প্রেমকে অনুমোদন দেয় না। তাছাড়া সমাজে এই প্রেমের কথা প্রকাশ্যে বলা যায় না বরং এটা শুধু প্রেমিক-প্রেমিকাদের (ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর) নিজস্ব পরিসরে কানাকানির ব্যাপার!

আমি হতভম্ভ হয়ে গেছি যখন এ বিষয়ে জনৈক লেখকের এই বক্তব্য পড়লাম– 'যদি আমরা কোনো নারীকে জিজ্ঞাসা করি যে, সে কোনটা প্রাধান্য দিবে, তার স্বামী-কর্তৃক আরেক নারীকে বিবাহ করা নাকি স্বামীর পরকীয়ায় লিপ্ত হওয়া! তাহলে নিশ্চয় সে উত্তর দিবে, আমি বরং অন্য হাজারো নারীর সঙ্গে স্বামীর পরকীয়াকে প্রাধান্য দিব। কারণ হয়তো সে একসময় সঠিক পথে ফিরে আসবে এবং তার দৃষ্টি একান্তভাবে আমার প্রতি নিবদ্ধ হবে।'

বলি কি, এমন নারীর ইজ্জত-সম্মানের আর কী-ই বাকি থাকবে, যে এমন পুরুষের স্ত্রী হওয়াকে মেনে নেয়, যে পুরুষ হাজারো নারীর সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়, অথচ একজন সৎ-চরিত্রের স্বামীর প্রথম স্ত্রী হওয়াকে সে মেনে নিতে পারে না! এই পর্যায়ের অনুভূতিশূন্য নারীর বক্তব্য এবং তৎকর্তৃক পুরুষদের মূল্যায়নের কী গুরুত্ব থাকতে পারে, যে কিনা সৎচরিত্রেরই মূল্য দিতে জানে না! বুঝে আসে না, উল্লিখিত লেখক এমন একজন নারীকে কী করে সালিস মানছেন আবার এমন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রসঙ্গে তার কথাকেই সিদ্ধান্ত বানাচ্ছেন! কোনো পুরুষের জন্য কি এটা বলা সম্ভব যে, আমি আমার স্ত্রীকে হাজারো পুরুষের সঙ্গে পরকীয়া করতে বাধা দিব না এবং আমার শুধু এই আশাবাদই যথেষ্ট যে, হয়তো সে কখনো সঠিক পথে ফিরে এসে একান্ত আমার হবে!

আমি পঁচিশ বছর আগে বহুবিবাহকে অপছন্দকারী পশ্চিমের অনুসারীদের চ্যালেঞ্জ করে তুর্কি ভাষায় কিছু পদ্য লিখেছিলাম। এর বিষয়বস্তু ছিল, দুই নারীর কথোপকথন ও সংলাপ। 'আস্তানা'র পত্রিকাগুলোতে আমি সেগুলো ছাপিয়েছিলাম। যে নারী তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহকে অপছন্দ করে কিন্তু স্বামীর পরকীয়া মেনে নিতে কষ্ট হয় না সেই সংলাপে আমি তার নাম দিয়েছিলাম– আলাপরত নারীদ্বয়ের একজনের ভাষ্যে– 'দুই শিংবিশিষ্ট নারী'।

এখন আমি উল্লিখিত লেখককে জিজ্ঞেস করতে চাই, যিনি বহুবিবাহের বিরোধীদেরকে 'সভ্যতার ধ্বজাধারী' বলে উল্লেখ করেছেন– তার উদ্ধৃত সভ্যতার ধ্বজাধারীদের মধ্যে কি সেই সভ্য(?) নারীও আছে, যার স্বামীকে সে হাজারো নারীর সঙ্গে পরকীয়া করার অনুমতি দিয়ে হাজার শিংবিশিষ্ট হতে তার অনীহা নেই!

উল্লিখিত লেখক কর্তৃক সেই নারীর মুখে এমন কথা উদ্ধৃত করার ব্যাপারটি সাধারণ মনে করার কারণ হলো, পুরুষদের মধ্যে এখন পাপাচারের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। ফলে বিষয়টি সহনীয় হয়ে গেছে এবং নারীরা পাপাচারী স্বামীকে মেনে নিতে স্বাভাবিক বোধ করছে। আর পুরুষরাও এমন পাপাচারী স্বামী গ্রহণ করার প্রচলনকে প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করছে।

এই লেখক দুই স্ত্রী থেকে সন্তান জন্মদানকারী পুরুষকে দোষী গণ্য করেন। যেন তিনি বলতে চাচ্ছেন, দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানেরা হলো কতিপয় শত্রু– যাদেরকে এই স্বামী নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্যাভিচারের ফসলকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় তাকে কিন্তু এই লেখক দোষী মনে করেন না। সম্ভবত তিনিও সেই নারীর মত বিষয়টিকে না দেখার ভান করছেন, যে নারীটি তার স্বামীর প্রেমিকা ও প্রেমিকার গর্ভজাত সন্তানকে না দেখার ভান করে, কিংবা তাদের দুজনকে একেবারে নাই মনে করে। কারণ উল্লিখিত প্রেমিকা ও তার সন্তান তো তো এই স্ত্রীর নিকট এবং অপরাপর মানুষের নিকট অজ্ঞাত এবং থেকেও না থাকার মতো। কিন্তু ইসলাম এই বিষয়টিকে সূক্ষ্ম নজরে দেখেছে। কারণ ইসলাম লক্ষ করেছে যে, ব্যভিচারের মধ্যে একটি আত্মাকে হত্যা করা হয়, তাকে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। এজন্য ইসলাম এর শাস্তিও নির্ধারণ করেছে অনুরূপ। [অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড– অনুবাদক]

উল্লিখিত লেখক বহুবিবাহের বিপক্ষে আরও যা উল্লেখ করেছেন তা হলো, এর ফলে নাকি বৈমাত্রেয় ভাইদের পরস্পরে শত্রুতা তৈরি হবে। স্বীকার করছি, এর আশঙ্কা রয়েছে। তবে এর কারণ বহুবিবাহ নয় বরং সন্তানদের দীনী তরবিয়ত ও দীক্ষার অভাব। এই অভাব

দূর করে নিলেই আশঙ্কা দূর হয়ে গেলো। কিন্তু এই লেখক সাহেব এদের সমান্তরালের বৈপিত্রেয় ভাইদের ব্যাপারে কী বলবেন! তাদের মাঝে সম্ভাব্য শত্রুতার বিষয়ে তার কী মন্তব্য! যে নারীর স্বামী মারা গেছে বা তাকে তালাক দেয়া হয়েছে, তার জন্য কি অন্য কারও সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন চালু করার কথা কল্পনা করা যায়, যেমনটি বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ করে আইন চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে? কারণ তার প্রথম স্বামীর ঔরসের সন্তানদের সঙ্গে দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসের সন্তানদেরও তো শত্রুতা তৈরি হতে পারে! এমনিভাবে যে সকল পুরুষের স্ত্রী মারা গেছে বা স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে তাদের জন্য কি দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ করার আইন চালু করার কল্পনা করা যায়? কারণ তাদের এই দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানদের সঙ্গেও তো প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের শত্রুতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে!

সারকথা হলো, এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বহুবিবাহ-বিরোধীগণ যারা সর্বদা বহুবিবাহের সামাজিক সমস্যা নিয়ে পড়ে থাকেন এবং সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করতে থাকেন, তাদের প্রতিটি পয়েন্টের বিপরীতে ব্যভিচার এবং তার মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতিগুলোর বিবরণ হাজির করা সম্ভব। অতঃপর কোন সুস্থ বিবেকের জন্য সম্ভব নয় যে, ব্যভিচার ও তার মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতিগুলোকে বহুবিবাহের সামাজিক সমস্যাগুলোর উপর প্রাধান্য দেবে। এজন্যই তুরস্কের বিশিষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ মানসিক ও স্নায়বিক রোগ বিশেষজ্ঞ ড. জনাব মাজহার উসমান বেগ তার 'আত-তিব্বুর রুহী' (মনোচিকিৎসা) নামক বইতে লেখেন, 'এক স্ত্রীতে সীমাবদ্ধতা (Monogamie) যেমনটি ইউরোপে দেখা যায় তা একটি মিথ্যা ও অবাস্তব সুশীলতা (Etequette)। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কথিত এই সুশীলতা পাপাচারের প্রতিবন্ধক হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং আমাদের উচিত হলো, পাপাচার বিস্তারের অনিবার্য পন্থা গ্রহণ না করে ধর্ম-অনুমোদিত বহুবিবাহের বৈধতাকে সম্মান জানানো।'

বহুবিবাহের বিরোধিতাকারী সেই লেখক পুরুষ ও নারীদের তুলনামূলক জনসংখ্যা নিয়েও আলাপ তুলেছেন। লিখেছেন, 'যদি যুদ্ধ হয় এবং সেখানে প্রচুর সংখ্যক পুরুষ মারা যায় তখন হয়তো ধর্মের (ধর্ম-অনুমোদিত বহুবিবাহ) দিকে ফিরে আসা সম্ভব হবে এবং প্রেক্ষাপট বিচারে তা বাস্তবায়ন করা যাবে; এর আগে নয়।'

এই লেখককে আমি আহ্বান জানাচ্ছি, দ্বিধাহীনভাবে এখনই নিজ ধর্মের দিকে ফিরে আসুন। এ ব্যাপারে আমি আমার উল্লিখিত গ্রন্থে বলেছিলাম, 'এখানে কয়েকটি বিষয় আছে; একেতো নারীরা সংখ্যায় পুরুষদের চেয়ে বেশি, আবার যুদ্ধগুলো পুরুষদের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে কতক পুরুষ বিবাহে আগ্রহী হয় না, সেইসাথে আপন মতামতে স্বাধীন এমন কতক নারীও বিয়ের ক্ষেত্রে যে কারণেই হোক যোগ্য পুরুষদের নির্দিষ্ট কাউকে গ্রহণ করতে চায়। তো বিষয় যেটাই হোক, সর্বকালেই এমন নারী নিশ্চয় বিদ্যমান থাকে যে কিনা কোনো পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী হতে পারে। এর ফলে বহুবিবাহ বাস্তবে ঘটার সুযোগ তৈরী হচ্ছে। নারী-পুরুষের সংখ্যাতাত্ত্বিক তুলনা করতে গেলে এই সম্ভাব্য একজন অতিরিক্ত নারীর বিদ্যমানতাই যথেষ্ট। হ্যাঁ, কোনও সময় যদি এমন নারীর অস্তিত্বই না থাকে, যে কিনা কোন পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী হতে পারে তাহলে তো দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রই অবশিষ্ট থাকে না। সেইসাথে বহুবিবাহ নিয়ে আপত্তিকারীদের আপত্তিরও প্রসঙ্গ থাকে না! তদুপরি আমার বহুবিবাহের পক্ষ-সমর্থন যেহেতু ব্যভিচার ও অবৈধ সম্পর্কের সঙ্গে তুলনামূলক, সুতরাং আমি প্রত্যেক এলাকার দেহপসারিণী নারীদের উদাহরণ টেনেই পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যাধিক্য প্রমাণ করে দিতে পারি। আমার জন্য প্রসঙ্গটিকে অনেক দূরে টেনে নেওয়ার কোনো দরকারই থাকে না। আর আমার উপর এই দায়ও বর্তায় না যে, মাথা গুণে গুণে সব এলাকায় নারীদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি সাব্যস্ত করে দেখাতে হবে। বরং পুরুষদের পরকীয়া বা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াটাই নারীদের আধিক্য প্রমাণ করে। সুতরাং যে সকল পুরুষের এই নারীদের কাছে যেতেই হবে তাদের উচিত এদেরকে বিয়ে করে নেওয়া– চাই এই পুরুষরা পূর্ব থেকে বিবাহিত হোক বা না হোক। আর এরা দেহজীবীদেরকে তাদের সম্ভোগের বিনিময়ে যে টাকা-পয়সা দিতো সেটাকে এখন তাদের ভরণপোষণ হিসেবে দিতে থাকবে। হ্যাঁ, আমি এটা তাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাই। কিন্তু বহুবিবাহের বিরোধীরা আমার এ প্রস্তাব মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। কারণ তারা চায় পুরুষরা সর্বদা এমন সুযোগের মধ্যে থাকুক যেন তারা চাহিবামাত্র শয্যাসঙ্গী বদলাতে পারে। এ থেকে বোঝা যায়, বহুবিবাহের বিরোধীদের মূল সমস্যা বহুবিবাহ নয় বরং বহুবিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষদের নির্দিষ্ট সীমারেখায় আটকে যাওয়ার ভীতি। ইউরোপের এক সাহিত্যিক ঠিকই লিখেছেন, 'মুসলমানদের চার নারীকে শয্যাসঙ্গী বানানোর সুযোগ আছে; কিন্তু উন্নত সভ্যতার দাবীদার ইউরোপিয়ানদের রয়েছে অগণিত নারীকে শয্যাসঙ্গী বানানোর সুযোগ।'

'সম্ভবত বিরোধীপক্ষ আমার কথায় তাজ্জব হয়ে বলবেন যে, প্রতিটি ব্যক্তি কী করে যার সঙ্গে ব্যভিচার করতে চায় তাকে বিয়ে করে নিবে! কারণ এই নারী তো বেশ্যাও হতে পারে! আবার হতে পারে কোনো প্রকাশ্য বা গোপন বেশ্যাখানার বাসিন্দা, যার দরজায় যে কেউ নক করলেই সে তার কাছে নিজেকে তুলে দেয়! অতএব আত্মসম্মান বজায় রেখে এই নারীর সঙ্গে বিয়ে-শাদী কীভাবে সম্ভব!? কিন্তু তাদের আশ্চর্যবোধকে বাড়িয়ে দিয়ে আমি আবারো বলছি, পতিতার সঙ্গে বিয়ে-শাদী কারো মানবিক মর্যাদা ততোটা ক্ষুণ্ন করে না যতোটা না তাদের সঙ্গে ব্যভিচার দ্বারা ক্ষুণ্ন হয়। একজন পুরুষ যত সম্মানীই হোক, যখন পতিতার সঙ্গে ব্যভিচারের ইচ্ছা করে সে-ও পতিতার স্তরে উপনীত হয়। কিন্তু বিয়ে এই পুরুষের মর্যাদা কমায় না; উল্টো এই নারীর মর্যাদার উন্নতি ঘটায় এবং তাকে পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে।'

উল্লিখিত লেখক আরও একটি কথা বলেছেন, 'নারীর এই অধিকার আছে যে, সে তার স্বামীকে একান্ত করে রাখবে, তার ভালোবাসাকে একান্ত করে রাখবে আর তার স্বামীকে প্রকাশ্যে বলবে, যদি আপনি আপনার বুকে আরেক নারীকে টেনে নেন তবে আমিও আমার বুকে আরেক পুরুষকে টেনে নিব। অর্থাৎ 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে

দাঁত'। এই লেখক একটু আগে কাল্পনিক এক নারীর যবানীতে উদ্ধৃত করেছিল যে, সে তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের বদলে হাজারো নারীর সাথে পরকীয়াকে প্রাধান্য দেবে। আমার মন্তব্যসহ যার আলোচনা উপরে বিবৃত হয়েছে। এখন এই লেখকের উদ্ধৃত দুটি বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় করলে ফলাফল দাঁড়াবে– যে নারীর স্বামী হাজারো নারীর সাথে পরকীয়া করবে সে নারী হাজারো পুরুষকে বুকে টেনে নেবে। কারণ 'চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত!' যদিও আরেক নারীকে বিয়ে করার উপর পরকীয়াকে প্রাধান্য দিয়ে সে অসংখ্য নারীর সাথে পরকীয়াকে তার স্বামীর জন্য অনুমোদন দিয়েছে! বিয়ের উপর পরকীয়াকে প্রাধান্যদানের বিষয়টি হয়তো এজন্য যে, যেন এই নারীর জন্য স্বামীর উপর প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হয়। কারণ এই নারী তার স্বামীকে এটা তো বলতে পারে না যে, আপনি যদি আরেকটা বিয়ে করেন তাহলে আমিও আরেকটা বিয়ে করব এবং একত্রে দুই স্বামীর সংসার করব। কেননা আইন এবং তার স্বভাব-প্রকৃতি তাকে এই অনুমতি দেয় না। কারণ তার জরায়ু বংশপরিচয়ে অস্পষ্টতা তৈরি হওয়া ব্যতীত দুই পুরুষের দুই সন্তানকে ধারণ করতে সক্ষম নয়। অথচ পুরুষের জন্য এটা সম্ভব যে, সে একাধিক নারীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর বাবা-মায়ের পরিচয়ে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হওয়া ছাড়াই তার একাধিক সন্তান জন্ম নেবে। এটা পুরুষের প্রকাশ্য বৈশিষ্ট্য যা তাকে নারী থেকে ভিন্নতা দান করে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, স্বামীদের অনাচার স্ত্রীদেরকেও উদ্বুদ্ধ করে এবং অনাচারের পথে টেনে নিয়ে যায়। আর পুরুষদের মধ্যে অনাচারী পুরুষের উপস্থিতি এমন ব্যাপার যা গোপনীয় কোনো বিষয় নয় যে, অস্বীকার করা যাবে। বরং চাইলেও এটাকে গোপন করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, বহুবিবাহের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা। যে বহুবিবাহকে মুসলমানরা সেদিন থেকে ভুলে গেছে, যেদিন থেকে অনাচার-ব্যভিচারকে বহুবিবাহের স্থলাভিষিক্ত করেছে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, বহুবিবাহ-নীতি চালুর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করা অনাচারকে কীভাবে মোকাবেলা করবো! সকল অনাচারকারীরা তো বিবাহিত নয় যে, তাদেরকে আমরা বিয়ে করিয়ে দেব!

এর জবাব হলো, অনাচারকারী– আরো যথার্থ ভাষায় বললে– যে নিজেকে অনাচারে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কায় দেখবে সে যদি অবিবাহিত হয় তাহলে বিবাহ করে নেবে, আর বিবাহিত হলে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বিয়ে করে নিবে, যেন তার প্রয়োজন মিটে যায়। যদি চারজনেও তার যথেষ্ট না হয়, পঞ্চমার আকর্ষণ বোধ করে তবে এক স্ত্রীকে তালাক দিবে এবং এই পঞ্চমাকে চতুর্থা বানিয়ে নেবে। তার এই কর্মকাণ্ডকে যদি সংসার ও পরিবার নিয়ে খেল-তামাশা মনে করা হয় তবে আমি বলব, এই খেল-তামাশা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে উত্তম। জ্বী, জনাব! কিছু খারাপ অন্য খারাপের তুলনায় ভালো হয়।

প্রতিপক্ষ যদি বলেন, এতো এতো বিবাহের খরচ কোথায় মিলবে! আমি তাদেরকে অর্থের ঐ সকল উৎস দেখিয়ে দেব যেখান থেকে অনাচারের কাজে খরচ করা হয়। বরং অনাচারের ক্ষেত্রে খরচ তো আরো বেশি!

কথা আরও আছে, নারীদের পর্দাবৃত থাকা এবং পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা পরিহার করার মাধ্যমে আমাদের ধর্মীয় পন্থার দিকে যদি ফিরে আসা হয় তবে এটি প্রবৃত্তিকে প্রশান্ত করবে এবং চাহিদা দমিয়ে দেবে। এর সাথে যদি যুক্ত হয় বহুবিবাহ তবে এগুলো একত্রে অনাচারকে প্রতিহত করবে। ক্ষেত্রবিশেষে তা খোদ বহুবিবাহের প্রয়োজনকেই দূর করে দিবে। কারণ বহুবিবাহ তো অনাচারকে সমানে সমানে প্রতিরোধের জন্য এসেছিল। (আর ইতোমধ্যেই তা প্রতিরোধ হয়ে গেছে।)

অনাচারের বিরুদ্ধে তৃতীয় ওষুধ হলো, একটা পর্যায় পর্যন্ত তালাককে সহজ করা, যেমনটি আমরা ঈঙ্গিত করে আসলাম। কারণ ইসলাম যেমন বিবাহের বিধান দিয়েছে তেমন তালাকের বিধানও দিয়েছে। কিন্তু নব্য সামাজিক রীতি– যা বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে প্রভাব বিস্তার করেছে– তালাককে একটি অসম্ভব বিষয়ে পরিণত করেছে। অবস্থাটা এমন যে, একজন পুরুষ তার সঙ্গিনীকে পছন্দ করে না তথাপি সে তাকে সারাজীবন সঙ্গ দিতে বাধ্য। ফলে যখন সে বাসা থেকে বের হয়, তার চোখ পৃথিবীর অপরাপর নারীদের উপর ঘুরে বেড়ায় আর দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে। কখনো হয়তো ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়ে যায়। এই ভয়াবহ গুনাহ সে বহন করে কিন্তু স্ত্রীকে তালাক দেয়ার দুর্নাম বহন করে না। এই রীতি আমাদের নিকট আমদানী হয়েছে পাশ্চাত্য থেকে। আমাদের মধ্যে যারা পশ্চিমের অনুকরণে আসক্ত তারা দেখেছে যে, পশ্চিমারা স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে না। সেইসঙ্গে আমরা তাদের থেকে ইসলামের তালাক বিষয়ে বিবিধ আপত্তি শুনেছি ফলে আমরা তালাককে আমাদের জন্য হারাম করে নিয়েছি। অথচ ইউরোপিয়ান ও আমেরিকানরা নিজেদের জন্য তালাককে সহজীকরণের প্রচেষ্টা করা শুরু করেছে। ফল দাঁড়াল এই যে, তারা আমাদের দেখে সুবিধা গ্রহণ করছে অথচ আমরা তাদের দেখে অসুবিধা গ্রহণ করছি। যে পুরুষ তার সঙ্গিনীর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে এবং সে ব্যভিচারের মাধ্যমে সঙ্গিনী নবায়ন করতে চায় সে যদি স্ত্রী পরিবর্তনের সুযোগ থেকে উপকৃত হতো তবে এই নিষিদ্ধ কাজ থেকে মুক্তির পন্থা ইসলামের মধ্যেই পেয়ে যেতো। বরং বহুবিবাহের পাকে পড়া থেকেও বাঁচতে পারতো। হয়তো বা সে তার দ্বিতীয় বিয়েতে সুখ খুঁজে পেতো আর তার আগের স্ত্রী তার পরবর্তী স্বামীর কাছে সুখ খুঁজে পেতো।

পূতঃপবিত্রতা বজায় রাখতে সহায়ক আরেকটি বিষয় হলো, ছেলে-মেয়ের বিয়ের বয়স নির্ধারণ করে দিয়ে বিয়েকে কঠিন না করা এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর তাদের বিবাহ বিলম্বিত না করা। ভরা যৌবন আর উষ্ণ রক্তের এই দীর্ঘ সময়গুলো তরুণ-তরুণীরা পবিত্রতার সাথে ও আত্মসম্বরণ করে থাকতে পারবে এই গ্যারান্টি কে দেবে! তারা পড়াশোনা করছে বিধায় এখন বিয়ে-শাদী করলে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটবে– এসব অজুহাত তাদের পিতাদেরকে এই ছাড়পত্র দেয় না যে, তারা সন্তানদের জৈবিক চাহিদা পূরণের বিষয়টি নিয়ে অমনোযোগী ও উদাসীন

থাকবে। আর খোদ এই তরুণ-তরুণীদের জন্যও এই ওযর গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ তারা নিজেরা প্রাপ্তবয়স্ক, যাদের উপর শরীয়তের বিধান বর্তায়। কারও জন্য এই যুক্তি দিয়ে অনাচারের অনুমতি নেই যে, সে এখনো পড়াশোনার ধাপে আছে তাই বিয়ে করা সম্ভব নয়। ইসলামী আইন প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য বিয়েকে বাধ্যতামূলক করেছে– যে নিজের ব্যাপারে অনাচারে লিপ্ত হবার আশঙ্কা করে। পড়াশোনায় ব্যস্ত বলে কারো জন্য ইসলাম অনাচারের অনুমোদন দেয় না। মুসলমানদের কর্তব্য হলো, বিয়ে এবং পড়াশোনার মধ্যে সমন্বয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করা যেন শিক্ষার্থীদের চরিত্রের সুরক্ষা হয়। যৌবনের উত্তুঙ্গ সময় অনুর্বর ও নিষ্ক্রীয়ভাবে কিংবা এমন উৎপাদনশীলতার মধ্য দিয়ে কাটানো যা দিনশেষে অনুর্বরতার দিকে ঠেলে দেয়– এটা স্বভাব ও প্রকৃতির অনুকূল বিষয় নয়। কিন্তু আমরা পশ্চিমাদের দেখেছি যে, তারা যৌবনের প্রারম্ভে বিবাহ করে না, তখন তাদের অনুকরণ করলাম। কিন্তু এটা খেয়াল করলাম না যে, পশ্চিমাদের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই যে, তাদের তরুণরা ইসলামের সামাজিক নীতিমালার দৃষ্টিতে গর্হিত বিভিন্ন পন্থায় যেমন তরুণীদের সাথে মেলা-মেশা, আলিঙ্গন ও প্রেমবিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের যৌন চাহিদা পূরণ করে থাকে। কিংবা হয়তো এটা নিয়ে আমরা ভেবেছি; কিন্তু পশ্চিমাদের এগুলো নিয়ে সিরিয়াস না হওয়ার বিষয়ে তাদের অনুকরণ করেছি।

খোলাসা হলো, ইসলাম সহজ। ইসলাম আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে সহজতা চায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ে ইসলামের প্রস্তাবনা হলো, হয়তো ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ত্রীকে রাখা, না হয় উত্তমভাবে ছেড়ে দেওয়া। যেমনটি কুরআনে কারীমের ভাষ্য। কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী যদিও বিবাহ শক্তিশালী চুক্তি এবং তালাক সবচে' অপছন্দনীয় হালাল কাজ আর আল্লাহ তা'আলা স্বাদ চাখার জন্য বিবাহ করা ও বিচ্ছিন্ন হওয়া নরনারীকে পছন্দ করেন না যেমনটি হাদীসে এসেছে; কিন্তু এই তিনটি বিষয়ের কোনোটিই স্বামী-স্ত্রীকে এমনভাবে লেপ্টে দেয় না যে, তারা আর ছুটতেই পারবে না, যেমনটি অন্যান্য ধর্মগুলোর বিবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান।

ইসলামে পুরুষ যেমন তালাক প্রদানের কর্তৃত্ব রাখে তেমন নারীও বিবাহকালীন শর্তারোপ কিংবা 'খুলা' পদ্ধতিতে নিজের উপর তালাক গ্রহণের কর্তৃত্ব রাখে। আবার কখনো সমাধানের জন্য দুই পক্ষের প্রেরিত সালিস এই কর্তৃত্ব রাখে। কারণ স্বামী-স্ত্রীর বিবাহের সম্পর্ক স্থায়ী হওয়া ইসলামের যতই কাঙ্ক্ষিত এবং পছন্দনীয় হোক কিন্তু এটা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা হবে না এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা কুরআনের ভাষ্যও বটে। উলামায়ে কেরাম এই সীমারেখার ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহর সীমারেখা হলো ঐ সকল বৈবাহিক অধিকার, যেগুলো ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বামীদের নিকট স্ত্রীদের প্রাপ্য হয় এবং স্ত্রীদের নিকট স্বামীদের প্রাপ্য হয়। সেইসঙ্গে স্ত্রীদের উপর স্বামীদের অভিভাবককত্বের অধিকারও আল্লাহর সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের এই বর্ণনাভঙ্গি থেকে স্পষ্ট যে, উল্লিখিত অধিকারগুলো অত্যধিক গুরুত্ব রাখে। উপরন্তু এটিও অস্পষ্ট নয় যে, স্বামী স্ত্রী উভয় পক্ষ থেকে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা উল্লিখিত আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণের মধ্যে শুরু থেকেই অন্তর্ভুক্ত। অতএব উভয়ের মধ্যে কারো মাধ্যমে আল্লাহ-প্রদত্ত সীমা লঙ্ঘনের আশঙ্কা দেখা দিলে ভদ্রভাবে, ন্যায়সঙ্গত পন্থায় এবং উত্তম আচরণের মাধ্যমে তালাক প্রদান ছাড়া উপায় থাকে না। এভাবে পারস্পরিক অসন্তোষ নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। স্বামীর প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করতে না দেওয়া স্ত্রীর দিক থেকে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে। কারণ প্রয়োজন দেখা দিলে দ্বিতীয় বিয়ে স্বামীর অধিকারসমূহের অন্তর্গত।

বিয়ে ও তালাকের এই স্বাধীনতা এবং এ ব্যাপারে যে সহজতা স্বামী-স্ত্রী লাভ করে এটাই হলো ইসলামের মধ্যপন্থা। যে মধ্যপন্থা নেই খৃস্টধর্মের সংকীর্ণতায় আর সমাজতন্ত্রের বিশৃঙ্খলায়। মূলনীতির জায়গায় ইসলামের এই মধ্যপন্থা সমাজতন্ত্রের চেয়ে দূরবর্তী নয়। ফলে একদিকে ইসলাম মানবতার সেই কল্যাণগুলোর দায়িত্ব নেয় যেগুলো মানুষ সমাজতন্ত্র থেকে কামনা করে, আবার সমাজতন্ত্রের বাড়াবাড়ির প্রয়োজনও মিটিয়ে দেয়। ইসলামে যাকাতের বিধান– যা ধনীদের সম্পদে গরীবদের অধিকার সাব্যস্ত করে– আমাদের দাবীর পক্ষে স্পষ্ট স্বাক্ষী। এমনিভাবে ইসলাম কর্তৃক বিবাহ-তালাকের সহজতা– যা এক স্ত্রীর বদলে অন্য স্ত্রী গ্রহণকে সহজ করেছে– এটিও অনুরূপ একটি উদাহরণ। অর্থাৎ যেসব বিষয় টেনে এনে সমাজতন্ত্র ও ইসলামকে কাছাকাছি দেখানো হয় তার উদাহরণ। এই সহজীকরণের মাধ্যমে ইসলামে মানুষের জন্য সঙ্গিনী নবায়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কিন্তু অনাচারী লোকেরা এবং সমাজবাদীরা এই নবায়নের বিষয়টিকে বল্গাহীন করে দিয়েছে। ইসলাম নবায়নের সুযোগ দেয় তবে সীমাবদ্ধতাসহ এবং শৃঙ্খলার সাথে। মদীনার আনসার সাহাবীগণ মুহাজির সাহাবীগণকে এতোটাই সহযোগিতা করতেন যে, যে আনসারীর কাছে দুই জন স্ত্রী ছিল তিনি তাদের একজনকে ছেড়ে দিয়ে কোনো মুহাজির সাহাবীর কাছে বিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যেতেন। এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, ইসলামে বিয়ে ও তালাকের বিষয়টি কতোটা সহজ এবং এটাও বোঝা যায় যে, কখনো বিয়ে ও তালাকের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আত্মত্যাগ ও অন্যকে প্রাধান্যদান; নিজের স্বার্থ রক্ষা করা নয়।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

ভাষান্তর: মাওলানা সাঈদুর রহমান মুমিনপুরী
মুদাররিস, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া,
বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা থেকে ধর্মশিক্ষা বাদ

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন দা.বা.

প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে ৩০ মে, ২০২২। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে চার ঘণ্টাব্যাপী এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ রূপরেখার কোনো স্তরে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। মূল্যবোধ ও নৈতিকতা দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্রমে রাখা হলেও তা হবে সেক্যুলার। কোনোক্রমে ধর্মশিক্ষা নয়। দেশের নানা জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না, এটা একটি স্বাধীন ও মর্যাদাবান জাতির জন্য কেবল বেদনাদায়ক নয়, লজ্জাকরও বটে। যে কোনো ধর্মবিশ্বাসী মানুষ চায়, তার সন্তান যথাযথভাবে ধর্মশিক্ষা লাভ করুক। তাদের সন্তানরা ধর্মহীন হয়ে বেড়ে উঠুক, তারা কোনো দিন চান না। ধর্মচর্চা করা মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞান না থাকলে ধর্মপালন করবে কী করে? পরিসংখ্যান মতে, তিন কোটি শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যায়। এর মধ্যে ৫০ লাখের মতো শিক্ষার্থী আলিয়া ও কওমী মাদরাসায় অধ্যয়ন করে। বাকি দুই কোটি ৫০ লাখ শিক্ষার্থী স্কুল-কলেজে পড়ে। দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর এসব শিক্ষার্থী বিশেষায়িত সাবজেক্টে ও ডিসিপ্লিনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে। সুতরাং সরল সমীকরণ, এসব শিক্ষার্থী পুরো শিক্ষাজীবনে ধর্মশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। বাস্তব জীবনে এসে ধর্মচর্চা করার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ২০-৩০ বছর শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ধর্মপরায়ণ মানুষের সংখ্যা কমবে আশঙ্কাজনক হারে।

২০২১সালের সেপ্টেম্বরে নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এখন আনুষ্ঠানিকভাবে দুই মন্ত্রণালয়ের এনসিসিসিতে অনুমোদন দেয়ায় এর আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলো। নতুন শিক্ষাক্রমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১০ ধরনের শেখার ক্ষেত্র ঠিক করা হয়েছে। এগুলো হলো ভাষা ও যোগাযোগ, গণিত ও যুক্তি, জীবন ও জীবিকা, সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব, পরিবেশ ও জলবায়ু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি। প্রাক-প্রাথমিকের শিশুদের আলাদা বই থাকবে না, শিক্ষকরাই শেখাবেন। এ ছাড়া নতুন শিক্ষাক্রমে এখন থেকে শিক্ষার্থীরা দশম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন সিলেবাসে পড়বে। আর শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক না বাণিজ্য বিভাগে পড়বে, সেই বিভাজন হবে একাদশ শ্রেণীতে গিয়ে। নতুন শিক্ষাক্রমে এখনকার মতো এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা হবে না। শুধু দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে হবে এসএসসি পরীক্ষা। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে দু'টি পাবলিক পরীক্ষা হবে। প্রতি বর্ষ শেষে বোর্ডের অধীনে এ পরীক্ষা হবে। এরপর এই দুই পরীক্ষার ফলের সমন্বয়ে এইচএসসির চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো: আবু বকর ছিদ্দীকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি। বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: আমিনুল ইসলাম খানসহ এনসিসিসির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। (প্রথম আলো, যুগান্তর, ৩০ মে, ২০২২)

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে সাতটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। বর্তমান শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৭৪ সালের কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৯৭ সালের শামসুল হক শিক্ষা কমিশন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ কমিটির প্রতিবেদনকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়েছেন (পৃষ্ঠা-২) অথচ কুদরত-এ খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব ছিল ধর্ম, ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাসের বহিঃপ্রকাশ। আসলে কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন ইসলামী আদর্শ বিরোধী এক কালো দলীল। এ রিপোর্ট ছিল তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আদর্শিক দীনতার এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এ কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবের প্রতিফলন দেখে অনেকে বিস্মিত না হলেও হতাশ হয়েছেন। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শিক নৈতিকতা থেকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের দূরে সরিয়ে রেখে একটি ধর্মবিবর্জিত 'ইহ-জাগতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল' তৈরির উপযোগী জনবল সৃষ্টিই বর্তমান শিক্ষা কমিটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

'২০১০ সালে প্রণীত সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রধানমন্ত্রী ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। এ নীতির ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২। কিন্তু ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতি, জাতীয় শিক্ষাক্রমে প্রতিফলিত হয়নি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শাখা থেকে ইসলামী শিক্ষাকে পুরোপুরি বাদ দেয়া হয়েছিল। আর বর্তমানে মানবিক শাখায় ইসলামী শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ শিক্ষা কলেজগুলোতে অবহেলিত অবস্থাতেই পড়ে আছে। এতে কলেজের ইসলামী শিক্ষার শিক্ষকরা ঐচ্ছিক বিষয়ের একজন গুরুত্বহীন শিক্ষকে পরিণত হয়ে আছেন। অন্য দিকে এ বিষয়ের ছাত্রসংখ্যাও আস্তে আস্তে লোপ পেতে পেতে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। অথচ ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষেও কলেজগুলোতে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসা– সব শাখার শিক্ষার্থী ইসলামী শিক্ষাকে আবশ্যিক সাবজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করত। আবার প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২০-এ 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়টিকে দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষা থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, দশম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়গুলোর বোর্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এসব বিষয়ের ক্লাস-পরীক্ষা নিয়মিত চালু থাকবে। বিষয়গুলোর সামষ্টিক মূল্যায়ন হবে। এ মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করেই একজন শিক্ষার্থীর গ্রেড নির্ধারিত হবে। এ প্রস্তাবে 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা'কে গুরুত্বহীন হিসেবে বোর্ড পরীক্ষার বাইরে রাখা হয়েছিল। এর মানে দাঁড়ায়, 'ইসলামী শিক্ষা' বিষয়ে গ্রেড উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের

পড়ার দরকার হবে না। শিক্ষকদেরও ক্লাস-পরীক্ষা গ্রহণের তেমন কোনো আগ্রহ থাকবে না। কারণ শিক্ষার্থীরা বোর্ড পরীক্ষা ছাড়া এটি পড়তে কখনোই আর আগ্রহী হবে না। আর শিক্ষকরাও এ বিষয়ে ক্লাস নিতে আর কোনো গুরুত্ব দেবেন না। অথচ জাতীয় শিক্ষানীতিতে সুস্পষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ ছিল, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা'। কিন্তু এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অমান্য ও অগ্রাহ্য করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রমে সম্পূর্ণভাবে 'ইসলামী শিক্ষা' বিষয়টিকে বাদ দেয়া হয়েছে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো যে, প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বক্তব্য প্রতিফলনের কোনো ব্যবস্থা ২০২০-এর শিক্ষাক্রমে রাখা হয়নি! আর শিক্ষানীতিতে ঘোষিত শিক্ষার্থীদের নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনের যে কথা বলা হয়েছে, সেটিও জাতীয়ভাবে বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ স্কুল ও কলেজে 'ইসলামী শিক্ষা' বিষয়ে পড়াশোনার আর কোনো সুযোগ নেই।' (প্রফেসর ড. মো: কামরুজ্জামান, ইনকিলাব, ঢাকা, ১১ জুন, ২০২২)।

২০২৭ সালের মধ্যে বর্তমান শিক্ষা রূপরেখা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। স্বাভাবিক কারণে পুরো জাতি এতে শঙ্কিত। আমাদের বিবেচনায়, এ রূপরেখাতে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা, লালিত সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটেনি। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিমপ্রধান দেশ। এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ধর্মপরায়ণ ও অসাম্প্রদায়িক। শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষা সঙ্কোচন জনগণ সহজে মেনে নেবেন না। ধর্মবিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ দেশ ও জাতির জন্য সমূহ বিপর্যয় ও অকল্যাণ বয়ে আনবে। এ রকম শিক্ষাধারা হবে বাংলাদেশের জন্য অভিশাপ। মুসলমানদের ইসলাম ধর্ম, হিন্দুদের সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধদের বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টানদের খ্রিষ্টধর্ম, পাহাড়িদের নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক ধর্মশিক্ষা, চর্চা ও প্রচার করার অধিকার থেকে রাষ্ট্র কোনো নাগরিককে বঞ্চিত করতে পারে না। আমাদের জানা মতে, শিক্ষা রূপরেখা প্রণয়ন কমিটি সেক্যুলার শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ ও মতামত নিলেও ইসলামী বিষয়ে পারদর্শী আলেম বা ইসলামিক স্কলারদের কোনো বক্তব্য বা মতামত গ্রহণ করেনি; ফলে নতুন শিক্ষা রূপরেখাটি হয়ে পড়েছে একদেশদর্শী, অপূর্ণাঙ্গ ও খণ্ডিত। জাতীয় শিক্ষা রূপরেখার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি দলীল প্রণয়নে যেভাবে ব্যাপকভিত্তিক মতামত নেয়া দরকার ছিল, তা করা হয়নি বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) সুপারিশ অনুযায়ী, এ শিক্ষা চালু হলে পুরো জাতি দ্রুত আদর্শিক মূল্যবোধবিবর্জিত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে।

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মো: কামরুজ্জামান বলেন, মূলত ইসলামী শিক্ষার প্রতি একটি মহলের কুদৃষ্টি সৃষ্টি হয়েছে ২০০১ সাল থেকে। এ সময়ের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি মহল ইসলামী শিক্ষাকে ধ্বংসের পাঁয়তারা শুরু করে। দশম শ্রেণীর ১০টি সাবজেক্টের কোনোটিতে তারা হাত দেননি। তারা হাত দেন ১০০ নম্বরের 'ইসলামী শিক্ষা'র প্রতি। তারা ১০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষাকে ৫০ নম্বরে সঙ্কুচিত করার হীন প্রয়াস শুরু করেন। দেশের সবাই জানেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ শুধু নির্বাচন পরিচালনা করা। তিন মাসের জন্য ক্ষমতায় থাকা সরকারের এ বিষয়ে নাক গলানোর কথাই নয়। কিন্তু ওই সরকারের ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা ইসলামবিদ্বেষী কিছু ব্যক্তি এ শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষার প্রতি তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় জনতার প্রতিবাদে তারা সেটা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। ইসলামী শিক্ষা নিয়ে এ ষড়যন্ত্র সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি। অন্য কোনো শিক্ষা নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা ও ষড়যন্ত্র নেই। যত মাথাব্যথা ও ষড়যন্ত্র শুধু ইসলাম ধর্ম আর 'ইসলামী শিক্ষা' নিয়ে। ষড়যন্ত্রের এ ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে শুরু হয় স্কুলের 'ইসলামী শিক্ষা' নিয়ে নতুন কারসাজি। এ সময় 'ইসলাম শিক্ষা' বইয়ের নাম পরিবর্তন করা হয়। নতুন নাম দেয়া হয় 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা'। অথচ হিন্দুধর্ম শিক্ষা ও খ্রিষ্টান ধর্ম শিক্ষা বইতে এ রকম কোনো নাম দেয়া হলো না। এখানে প্রচ্ছন্নভাবে 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' দুটো নামের মাঝখানে 'ও' অব্যয় দিয়ে দুটো ভিন্ন জিনিস বোঝানো হলো। আর উভয়ের মধ্যে বিরোধ আছে মর্মে সূত্রে একটি কারসাজির বীজ বপন করা হলো। কারসাজির এ সূত্র ধরে দুষ্টচক্রটির পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল এ শিক্ষাকে পাঠ্যসূচি থেকে স্থায়ীভাবে বাদ দেয়া। চক্রটি তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শতভাগ সফল হলো। বর্তমানে ২০২২ সালের শিক্ষাক্রমে 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' নামক বইটি সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে দিলো (ইনকিলাব, ১১ জুন, ২০২২)।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার লেখক শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'একটি সমাজের পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও মূল্যবোধের হস্তান্তর হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য'। আধ্যাত্মিক, মানবিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিই শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত। ঐশী চেতনায় লালিত আদর্শ ও মূল্যবোধ ছাড়া শুধু ইহজাগতিক ও বস্তুতান্ত্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো আদর্শ ও সৎ নাগরিক তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যে প্রচলিত আদর্শিক মূল্যবোধবিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক স্খলন রীতিমতো আঁতকে ওঠার মতো। বর্তমানে অনুমোদিত শিক্ষা রূপরেখা ধর্মশিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে অনাবশ্যক গণ্য করে কালান্তরে এর অস্তিত্ব বিনাশ করে দেবে। লর্ড মেকলে বা ওয়ারেন হেস্টিংস যা করেনি বা করতে পারেনি, এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তা পুরোপুরি কার্যকর হবে। বর্তমান শিক্ষার রূপরেখার সাথে আমাদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক বোধের সম্পর্ক নেই। স্কুল-কলেজে ধর্মশিক্ষা তুলে দিলে মানুষ ধর্মবিমুখ, জীবনবিমুখ ও সমাজবিমুখ হয়ে পড়বে। জনগণের বিশ্বাস ও বোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কোনো শিক্ষা রূপকল্প চলতে পারে না।

আমরা প্রস্তাব করছি, নৈতিকতাসম্পন্ন জনশক্তি তৈরিতে শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক। ধর্মশিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যকীয় করতে হবে। আমরা সরকারের নীতিনির্ধারক মহলকে আমাদের শঙ্কা, সংশয়, প্রস্তাব ও দাবীগুলো যৌক্তিকভাবে বিবেচনা করার আবেদন জানাই। একইসাথে জনগণকে ধর্মীয় শিক্ষা ও জাতীয় মূল্যবোধপরিপন্থী এ শিক্ষা রূপরেখা বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও গবেষক

(দৈনিক নয়াদিগন্তের সৌজন্যে)

আ ত্ম জী ব নী

দারুল উলূম করাচীর মুখপত্র মাসিক আল-বালাগ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ধারাবাহিক আত্মজীবনী 'ইয়াদেঁ' প্রকাশ করছে। রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার মুখপত্র দ্বি-মাসিক রাবেতা ইয়াদেঁ-এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করছে। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সম্মতিক্রমে অনুবাদ করছেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা সমাপনকারী– ***মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহীমী।***

ইয়াদেঁ - یادیں

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

(একাদশ পর্ব -گیارھویں قسط)

কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয়

হযরত মাওলানা সাহবান মাহমূদ সাহেব রহ. পাঠ-দানের পাশাপাশি কাব্য-সাহিত্যের বীজও আমার হৃদয়ে বপন করে দিয়েছিলেন। হযরত ছিলেন একাধারে ও কবি ও কাব্যরসিক। চমৎকার সব কবিতা লিখতেন এবং আবৃত্তিও করতেন বড়ো চমৎকার। দরস প্রদানকালে প্রসঙ্গক্রমে তিনি তার পছন্দনীয় পংক্তিমালা আবৃত্তি করেই ক্ষান্ত হতেন না, সাহিত্যবিচারে তার মান নির্ণয়সহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদিও বিশ্লেষণ করে বোঝাতেন। আবার কখনো একটি পংক্তি শুনিয়ে আমাদেরকে বলতেন, পরের পংক্তি তোমরা বানিয়ে আনবে। আমরা সাধ্যমতো বানিয়ে এনে হযরতকে দেখাতাম। তিনি সেগুলো সংশোধন করে দিতেন।

অপরদিকে আমাদের ঘরেও শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ছিল, যেমনটি আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। আব্বাজান রহ. কেবল উর্দূ ভাষায় নয় আরবী-ফার্সীতেও কবিতা লিখতেন। আমাদের বড় ভাই হযরত যাকী কাইফী রহ. তো রীতিমতো কবিই ছিলেন। সে সুবাদে আমাদের বাসায় হরহামেশা দেশসেরা কবি-সাহিত্যিকদের যাতায়াত ছিলো। আমাদের বোনদেরও শিল্প-সাহিত্যের প্রতি ভীষণ আগ্রহ ছিল। আমার ভাই জনাব মুহাম্মাদ ওলী রাযী সাহেবও কবিতা লিখতেন। ঘরের ভেতর আমাদের আনন্দ উদযাপনের অন্যতম উপকরণ ছিলো, কখনো ভাইবোন একত্র হলে দ্বি-পাক্ষিক কবিতা আবৃত্তির আসর জমে যেতো। কেউ কোথাও ভালো কবিতা পড়লে বা গজল শুনলে এই আসরে তা শোনাতো এবং সবাই মিলে উপভোগ করতো। আবার কখনো ঘরোয়া সাহিত্যের আসর বসতো। ছোট আপা হাফিজ জালান্ধারী'র 'শাহনামা ইসলাম' পত্রিকা থেকে গল্প-কবিতা পড়ে শোনাতেন। আমরা তন্ময় হয়ে শুনতাম।

এমনই এক সাহিত্য ও কাব্যিক পরিবেশের বদৌলতে শৈশব থেকে আমার ভেতরেও কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিলো। নয় বছর বয়সেই আমার বহু কবিতা ও গজল ঠোঁটস্থ হয়ে গিয়েছিলো। সে সময় 'সাথী' নামে কচিকাঁচাদের একটি সাহিত্য-সাময়িকী প্রকাশ পেতো। আমার বড় ভাই জনাব রাযী কাইফী রহ. আমার নামেও একটি সংখ্যা জারি করে রেখেছিলেন। সেটি হাতে পেলে তো আমি বাঁধভাঙা উল্লাসে মেতে উঠতাম। প্রতিমাসে অধীর আগ্রহে পত্রিকাটির প্রহর গুনতাম। মাসের শুরুতে ডাকপিয়নের প্রতীক্ষায় থাকতাম। হাতে পৌঁছার পর শুরু থেকে শেষ অবধি পড়া ছাড়া আমার আর বিরাম নেই! একপর্যায়ে ধীরেধীরে আমারও কলম হাতে নেয়ার হিম্মত জাগতে শুরু করল। ছোট আপা এইকাজে আমার একান্ত সহযোগী ছিলেন। তিনি নিয়মিত হিম্মত যোগাতেন। 'সাথী' পত্রিকায় 'কলমী দোস্ত' (কলমবন্ধু) নামে একটি বিভাগ থাকতো। শিশু-কিশোররা সেখানে নিজেদের নাম-ঠিকানা ছাপিয়ে অন্যদেরকে দোস্তী পাতানোর আমন্ত্রণ জানাতো। আমার বোন আমাকেও সেখানে চিঠি লেখার পরামর্শ দিলেন যে, এতে আমার লেখালেখির অনুশীলনটা হয়ে যাবে। সুতরাং ইতোমধ্যে যারা 'কলমদোস্তী'র আহ্বান জানিয়েছে আমি তাদের নামগুলো পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম। অনেকগুলো নামের মধ্যে 'মুজাহিদ' নামের উপর আমার চোখ আটকে গেলো। নামটি আমার ভীষণ পছন্দ হলো। ঠিকানা দেখে জানতে পারলাম বন্ধুটি আফ্রিকার নাইরোবি শহরের নাগরিক। এটা সে সময় টাঙ্গানিকার রাজধানী ছিল। পরবর্তীকালে টাঙ্গানিকার নাম হয়েছে কেনিয়া।

আমি শুধু 'মুজাহিদ' নামের ভালোবাসায় অনুরাগী হয়ে 'কলমদোস্তী'র জন্য তাকে নির্বাচন করেছিলাম। কাঁচাহাতে, ভুল-শুদ্ধের সংমিশ্রণে একটি চিঠি লিখে ছোট আপার হাতে দিলাম। প্রয়োজনীয় সংশোধন শেষে ছোট আপা এটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন। আমি গিয়ে সেটি ডাকঘরে জমা দিয়ে আসলাম। কিছুদিন পর চিঠির জবাব আসলো, আমিও ফিরতি জবাব লিখলাম। এভাবে আমার 'কলমদোস্তী' চলতে থাকলো। আমি আধাপাকা হাতে চিঠি লিখতাম, ছোট আপা সম্পাদনা করে তাতে সাহিত্য-উপাদান যুক্ত করে দিতেন। এভাবে লিখতে লিখতে লেখালেখিতে আমার হাত পাকতে থাকলো।

সে সময় জাতীয় দৈনিক 'জঙ্গ' পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে পাঠকেরা কোন একটি বিষয় নিয়ে আলাপ তুলতো। সেই সূত্র ধরে পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকতো। একবার মহিলারা কবি হতে পারবেন কিনা এমন একটি অনর্থক বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনার ঝড় উঠলো। আপা আমাকে বললেন, তুমিও একটি কলাম লিখে দাও। আপার আদেশ পালনার্থে আমি একটি লেখা প্রস্তুত করলাম এবং সেটি 'জঙ্গ' পত্রিকায় صنف نازک اور شاعری শিরোনামে প্রকাশ পেলো। এই প্রথম কোথাও আমার লেখা ছাপা হলো। আরেকবার পাকিস্তানী রুপিতে কায়েদে আজম জিন্নাহর ছবি থাকবে কিনা- এই নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা উঠলো। আমি نوٹوں پر تصویر শিরোনামে আরেকটি কলাম লিখলাম। সেখানে আমি মুদ্রায় ছবি ছাপা নাজায়েয হওয়ার পক্ষে অবস্থান নিলাম এবং এর সঙ্গে ব্যক্তিপূজার বিষয়টি জড়িত থাকার কথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে বললাম, মুদ্রায় কোন ছবি না ছাপাই উচিৎ। আরেকবার সহশিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক শুরু হলো। তখনও আমি সহশিক্ষার বিপক্ষে দলীলভিত্তিক একটি কলাম লিখেছি। আমার এ সকল কলাম ও চিঠিপত্র জাতীয় দৈনিক 'জঙ্গ'-এ প্রকাশ পেতে থাকলো। আমার এসব কাজে ছোট আপা কেবল পৃষ্ঠপোষকতাই নয়; নিয়মিত সম্পাদনা ও সংযোজন-বিয়োজন করে দিতেন। এমনকি আমার এই দাবী একটুও ভুল হবে না যে, আমার লেখালেখির যাবতীয় খেদমত ছোট আপার ওই তা'লীম-তারবিয়াত, সাহস যোগানো এবং নিবিড় পরিচর্যার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ সালে লাহোরের জনাব মরহুম শাফকত আলী সাহেবের সঙ্গে ছোট আপার বিয়ে হয়। তখন আমার বয়স ১০ বছর। ঘটনাক্রমে তার

বিয়ের দিনে গোটা দেশ খতমে নবুওয়াত আন্দোলনে উত্তাল ছিলো। সেদিনই আরামবাগে একটি আজিমুশ্বান জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে হযরত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ. বক্তব্য দিয়েছিলেন। তখন দেশের সকল আকাবির উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছিলো। আব্বাজানের নামেও ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছিলো। তিনি স্বীয় কন্যার বিয়েতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিনা– এই নিয়েও সন্দেহ ছিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে হেফাযত করেছেন এবং বিয়ের যাবতীয় আয়োজন সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। মনে পড়ে, ছোট আপার শ্বশুরালয়ে গমনের পর তার বিচ্ছেদ-বিরহে কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি শুধুই কেঁদেছি। তিনি বছরে একবার করাচী আসতেন। তার আগমনের দিনটি হতো আমার জন্য ঈদের দিন। তার বিরহ-যাতনা এবং হৃদয়মথিত আবেগ আমি একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলাম। ছোট আপা করাচী বেড়াতে আসলে আমি তাকে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাই। তিনি আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠেন। অতঃপর লাহোরে গিয়ে তিনিও একই মাত্রা ও ছন্দে আমাকে একটি জবাবী কবিতা লিখে পাঠান।

আমার বয়স যখন বারো বছর পূর্ণ হলো। ইতোমধ্যে ১৩৭৪ হিজরীর শাওয়ালে আমাদের নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে গেছে। সে বছরও (১৩৭৪-৭৫ হিজরী) আমাদের শরহেজামী, মাকামাতে হারীরী, কানযুদ্দাকাইক, উসূলুশ-শাশী, কুতবী, শরহে তাহযীব এবং আল-বালাগাতুল ওয়াযিহাহ-সহ সকল কিতাব হযরত মাওলানা সাহবান মাহমূদ সাহেবের দায়িত্বে ছিলো। পূর্বের ধারাবাহিকতায় আমরাও তার চমৎকার পাঠদানশৈলী থেকে উপকৃত হতে থাকলাম। হযরত সম্পর্কে আমি ইতোপূর্বে লিখেছি যে, তখন তার কাব্য-সাহিত্যের প্রতি ভীষণ আকর্ষণ ছিলো এবং তিনি নিজেও কবিতা লিখতেন। শরহেজামীর মতো (নিরস) কিতাবের দরসেও তিনি তার কাব্যিক রঙ ছড়াতেন। সে বছর তার কাছে আল-বালাগাতুল ওয়াযিহাহ পড়ার সময় তার কাব্যিক আকর্ষণ আমাদের দরসকে দ্বিগুণ প্রাণবন্ত করে তুলেছিলো। খোদ আল-বালাগাতুল ওয়াযিহাহ কিতাবটিই সাহিত্যের ফুল-ফসলে ভরপুর ছিল উপরন্তু তিনি ফাসাহাত-বালাগাতের উদাহরণগুলো উর্দু কাব্যভাণ্ডার থেকেও উদ্ধৃত করতেন। ফলে গোটা দরস যেনো বসন্তের মনোরম পুষ্পোদ্যানে পরিণত হতো। মনে পড়ছে, হযরত تعقید معنوی (বিন্যাস-বিশৃঙ্খলাগত মর্মজটিলতা)-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে কবি মুমিনের এই পংক্তিটি শুনিয়েছিলেন-

خیال خواب راحت ہے علاج اس بد گمانی کا۔
وہ ظالم قبر میں مومن مرا شانہ ہلاتا ہے۔

হযরত বলেছিলেন, এই পংক্তির 'ইলাজ ইস বদগোমানী কা'-এর পর প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসবে এবং যতক্ষণ না এতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন সংযোজন করা হবে কিংবা প্রশ্নমূলক বাক্য হিসেবে পড়া না হবে এর মর্ম ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে না।

মোটকথা আমরা তার কাব্য ও সাহিত্যপ্রীতি থেকে অনেক অনেক উপকৃত হয়েছি।

বিকেলে আমরা বাসায় ফিরতাম এবং মাগরিব অবধি ব্র্যান্স গার্ডেন অথবা পলোগ্রাউন্ডে কিছুক্ষণ খেলাধুলা ও পায়চারি করে ফের মুতালা'আ ও পড়াশোনায় লেগে যেতাম। কখনো আমাদের ঘরে ভাই-বোনদের মিলনমেলা হতো। সেখানে বেশিরভাগ শে'র-বাহাস এবং কবিতা আবৃত্তির আসর বসতো। সেই আসরে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে আমার বেশি বেশি শে'র ও কবিতা মুখস্থ করার আগ্রহ জন্মাতো। তখন হাফিজ জলন্ধরীর 'শাহনামা ইসলাম' ঘরে আসলে আমরা ছোট আপাকে ঘিরে বসতাম। তিনি আমাদেরকে তার সুবিন্যস্ত সুরেলা আবৃত্তির দ্বারা মুগ্ধ করতেন।

সে আওয়াজ আজও যেনো আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয়। শাহনামা ইসলামের সাথে আমার এতটাই হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল যে, তার বহু পৃষ্ঠা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। বাস্তব সত্য কথা হচ্ছে, গাযওয়ায়ে বদর, গাযওয়ায়ে উহুদ এবং গাযওয়ায়ে আহযাবের বিশদ ঘটনাবলী আমি কিতাবে অনেক পরে পড়েছি। শাহনামা'র কল্যাণে আমি তার আগেই এসব ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জেনে গিয়েছিলাম।

এছাড়াও ঘরে কেউ কোনো কাব্য-সাহিত্যের বই নিয়ে আসলে সবাই জড়ো হয়ে তার সাহিত্যসুধা উপভোগ করতাম। কখনো মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী রহ.-এর 'আন-নাবিয়্যুল খাতিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' পড়া হতো। কখনো মাওলানা আবুল কালাম আযাদের 'গোবারে খাতির' আবার কখনো মাওলানা আসগর হুসাইন সাহেবের 'খাবে শিরী'। কখনো পাতরাস বুখারীর 'মাযাহিয়্যা মাযামীন' পড়া হতো। মোটকথা আমাদের ভাইবোনদের এই মসলিস ও মিলনমেলা বর্ণিল ও আকর্ষণীয় হতো। আর যদি কখনো আব্বাজানের সাহচর্যের সুযোগ হতো তবে তো সোনায় সোহাগা। এ সবের প্রতি আমরা তখন থোড়াই কেয়ার করতাম। আব্বাজানের সঙ্গে আমাদের যতটুকু সময় কাটতো বড় আনন্দ ও প্রফুল্লতার মাঝেই কাটতো। আব্বাজান আমাদের সঙ্গে খোলামেলা মিশে যেতেন। কখনো তিনি বুযুর্গদের শিক্ষণীয় ঘটনা শোনাতেন। কখনো ইসলামের ইতিহাসভাণ্ডার মেলে ধরতেন। আবার কখনো তার দৈনন্দিনের ব্যস্ততা ও ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করতেন।

সে সময় রেডিও পাকিস্তানে বড় উপকারী কিছু পোগ্রাম হতো। দিনের শুরু হতো মরহুম কারী যাহের কাসেমী সাহেবের তিলাওয়াত দিয়ে। তারপর হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক থানবী রহ.-এর ধারাবাহিক দরসে কুরআন অনুষ্ঠিত হতো। রেডিও পাকিস্তানের তৎকালীন ডাইরেক্টর জনাব যুলফাকার আলী বুখারীর অনুরোধে প্রতি শুক্রবার আব্বাজান রহ.-এর মা'আরিফুল কুরআনেরও দরস হতো। অন্যান্য পোগ্রামগুলোতেও আজকালের মতো বেহুদাকর্ম ও বেহায়াপনা কম হতো। রেডিওতে রুচিশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতির আধিক্য পরিলক্ষিত হতো। বেশিরভাগ প্রোগ্রাম জ্ঞানভাণ্ডারে সমৃদ্ধ থাকতো। 'চীস্তান কা খেল' নামে একটি প্রোগ্রাম ছিলো, যেখানে সাধারণজ্ঞানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। এই চ্যানেলে প্রতি সপ্তাহে দ্বি-পাক্ষিক কাব্য-উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। সেখানে দেশসেরা প্রথিতযশা সব কবি-শিল্পীরা অংশ নিতেন। হাফিজ জলন্ধরী, আদীব সাহারানপুরী, হেমায়াত আলী শায়ের, শায়ের লক্ষ্ণভী, মাহের আল-কাদরী, রঈস আমরোহী, কমর জালালাভী, আরম লক্ষ্ণভী প্রমুখ কবি-শিল্পীরা তো প্রতি সপ্তাহেই সেই আসরে অংশ নিয়ে নতুন নতুন কবিতা শোনাতেন। আমরা সব ভাই-বোন আগ্রহভরে রেডিওতে সেগুলো শুনতাম। কখনো হিন্দুস্তান থেকেও কবি-শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হতো। অতিথি শিল্পীদের মধ্যে জিগার মুরাদাবাদী, শাকীল বাদায়ূনী এবং জগন্নাথ আজাদকে আমরা সেই প্রোগ্রামে প্রথমবারের মতো শুনতে পেয়েছিলাম।

এখন মনে হচ্ছে, সে সময় আমাদের আনন্দ-ফুর্তির যাবতীয় আয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যকেন্দ্রিক ছিলো। ফলে শিশু-কিশোরদের জ্ঞানগরিমা বৃদ্ধি পেতো এবং শিল্প-সাহিত্যে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধন হতো। সে সব ঘরোয়া মজলিস ও আয়োজনের কারণে আমার নিজেরও বই-পুস্তকের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিলো।

(চলবে, ইনশাআল্লাহ)

দি ক নি র্দে শ না

তালিবে ইলম সন্তানের প্রতি অভিভাবকের কর্তব্য

মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেব দা.বা.

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى...

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শোকর আদায়ের পর আপনাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনারা দূর-দূরান্ত থেকে নিজেদের নির্ধারিত কর্মব্যস্ততা স্থগিত রেখে আপনারা আগমন করেছেন। নিজ নিজ সন্তানের ভবিষ্যৎ সাফল্যের লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের আগমন ও নেক নিয়তকে কবুল করুন। প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণ যারা এই মজলিসের আয়োজন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যও সফল করুন। সর্বোপরি শিক্ষকগণ আপনাদের সন্তানদের পেছনে যে অক্লান্ত মেহনত করছেন সেটাও শতভাগ ফলপ্রসূ করুন।

আমি চারটি বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ–

এক. শিক্ষার্থীকে বিপথগামী হওয়ার কারণসমূহ থেকে বিরত রাখা।

দুই. সন্তানের গতিবিধির প্রতি লক্ষ রাখা।

তিন. ছুটিকালীন শিক্ষার্থীর তা'লীম-তরবিয়তের প্রতি খেয়াল রাখা।

চার. অন্যান্য সন্তানের তুলনায় দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তানের প্রতি বিশেষ কল্যাণের দৃষ্টি রাখা।

বিপথগামী হওয়ার কারণসমূহ

শিক্ষার্থীর বিপথগামী হওয়ার কারণগুলো কখনও শিক্ষার্থীর দ্বারা সংঘটিত হয় আবার কখনও অভিভাবকদের থেকে সংঘটিত হয়।

অভিভাবক দ্বারা সংঘটিত কারণ

০১. অভিভাবকের ভুল চিন্তাধারা। অর্থাৎ সন্তানকে কওমী মাদরাসায় পাঠানোর ক্ষেত্রে অভিভাবকের চিন্তাধারা সঠিক নয়। কলিজার টুকরো সন্তানকে তিনি মাদরাসায় কেন পাঠিয়েছেন এটাই তার কাছে স্পষ্ট নয়। পৃথিবীতে বহু রকমের ভালো কাজ আছে। আছে দীনদার হওয়ারও নানা উপায়। আলেম না হয়েও একজন মানুষ দীনদার হতে পারে। যেমন দীনদার ব্যবসায়ী, দীনদার ডাক্তার, দীনদার ইঞ্জিনিয়ার। বুযুর্গানে দীনের সোহবত ও সান্নিধ্যের কল্যাণে অনেক সাধারণ মানুষও দীনের বহু খিদমত করেছেন, করছেন। আপনি যে আপনার প্রিয় সন্তানকে এই প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছেন এ ব্যাপারে আপনার নিয়ত ও উদ্দেশ্য কী? আপনি কি আপনার সন্তানকে একজন আলেম ও সফল ব্যবসায়ী হিসেবে দেখতে চান, না দীনী শিক্ষায় পারদর্শী একজন খালেছ আলেমে দীন হিসেবে দেখতে চান? যদি আপনি তাকে কুরআন-সুন্নাহয় পারদর্শী একজন নির্ভেজাল আলেমে দীন হিসেবে দেখতে চান তাহলে আপনাকে দীন ও দুনিয়ার সমন্বয় চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। সন্তান আলেমও হবে আবার সফল ব্যবসায়ী, যোগ্য প্রকৌশলী ও খ্যাতিমান চিকিৎসকও হবে এ জাতীয় চিন্তা পরিহার করতে হবে। একজন দীনদার ডাক্তার, দীনদার ইঞ্জিনিয়ার, দীনদার ব্যবসায়ী নিঃসন্দেহে ভালো মানুষ। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে কিছু ফযীলতও বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের দীনদারী ও মানবসেবা কবুল করেন তাহলে তারাও নাজাত পাবে। কিন্তু একজন হক্কানী রব্বানী আলেমে দীন আর একজন দীনদার ডাক্তারের মর্যাদা কি আখেরাতে সমান হবে? কিছুতেই নয়। সমান তো দূরের কথা কাছাকাছিও হবে না। হাদীস শরীফে এসেছে, আখেরাতে আম্বিয়ায়ে কেরামের মর্যাদার পরেই হবে আলেমদের মর্যাদা। একজন সাধারণ দীনদার যতই ইবাদত-বন্দেগী করুক এবং মুজাহাদা ও সাধনা করুক সে কখনই আলেমে দীনের স্তরে পৌঁছতে পারবে না।

আপনার সন্তানের পক্ষে যখন আখেরাতে এত বড় উঁচু মর্যাদা লাভের সুযোগ এসেছে তখন কেন আপনি তার জন্য নিচু স্তরের চিন্তা করবেন? আপনার সন্তান যদি আলেম হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলমে দীনের খিদমতের জন্য কবুল করেন তাহলে আখেরাতে তার কল্পনাতীত উচ্চ মর্যাদা লাভ হবে। কাজেই কেন আপনি তার জন্য আলেম হওয়ার পাশাপাশি জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কিংবা সফল ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখবেন? এ ধরণের সমন্বয়ের মর্ম হলো, আপনার সন্তানের জন্য নিছক আলেমে দীন হিসেবে যে উঁচু মর্যাদার সুযোগ রয়েছে আপনি অভিভাবক হয়েও তার জন্য সে মর্যাদা পছন্দ করছেন না, তাকে নিচুতে নিয়ে আসার চিন্তা করছেন!

একজন ডাক্তার সাহেব তার ছেলেকে হাফেজ বানিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক রয়েছে। তার ইচ্ছা ছেলেটি আলেম হবে। কিন্তু তার বক্তব্য হলো, আপনাদের মাদরাসায় বাংলা-ইংরেজীর দিকটা আরেকটু বেশি হলে ভালো হতো। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ দিলেন যেখানে দীনী শিক্ষার পাশাপাশি এসএসসি পরীক্ষা দেয়ারও ব্যবস্থা আছে। তাকে বললাম, আপনি এমনটি কেন চাচ্ছেন? বললেন, সবাই কি আলেম হয়ে শিক্ষকতা করবে? সবাই কি ইমামতি করবে? বললাম, সবাই শিক্ষকতা করুক কিংবা ইমামতি করুক এটা আমরা চাইলেও হবে না। এই সৌভাগ্য সবার নসীবে থাকে না। তবে আপনার ছেলে যদি আলেম হয়ে শিক্ষকতার তাওফীক পায়, ইমমতির সুযোগ লাভ করে তাহলে মনে করতে হবে, আপনি অনেক আগে বেড়ে গিয়েছেন এবং আপনার ছেলেটিও অনেক আগে বেড়ে গিয়েছে। তাহলে কেন আপনি আপনার ছেলেকে নিচের স্তরে রেখে দেয়ার চিন্তা করছেন? কেন তাকে আগে বাড়ানোর ফিকির করছেন না? যা হোক, আমার সব কথা তার বুঝে আসেনি। তিনি তার সন্তানকে সেই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করেছেন যেখানে এসএসসি পরীক্ষা দেয়ারও সুযোগ রয়েছে।

আমাদের মাদরাসায় যাদেরকে ভর্তি করা হয় তাদের ভর্তিফরমে একটা কানুন আছে যে, এই মাদরাসায় অধ্যয়নকালীন সে আলিয়া মাদরাসার কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কেন পারবে না? আলিয়া মাদরাসায় পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকলে এই সূত্র ধরে হয়তো সে কলেজ-ভার্সিটিতে চলে যাবে। জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। ফলে হবে কি, সে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর দীনী মাদরাসায় শিক্ষকতা করবে তো দূরের কথা, নিজের বেশ-ভূষাও টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। এটা কোন কাল্পনিক বিষয় নয়, এ

ব্যাপারে আমাদের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে।

যে অভিভাবক তার সন্তানকে কওমী মাদরাসা থেকে হাফেজ বানাল, অতঃপর এমন এক মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করল যেখানে দীনী শিক্ষার পাশাপাশি এসএসসি বা দাখিল পরীক্ষা দেওয়ারও সুযোগ রয়েছে, অতঃপর এই সূত্র ধরে সন্তানটি যদি একসময় কলেজ-ভার্সিটির শিক্ষার্থী হয়ে লাইনচ্যুত হয়ে যায় তাহলে এমন অভিভাবকে কিভাবে ভাগ্যবান বলা যায়! এ ধরণের ক্ষেত্রে আমাদের মুফতী সাহেব হুযূর দা.বা. একটা চমৎকার উপমা পেশ করে থাকেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে বাদশাহ হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে নিজেকে চর্মকারের পেশায় নিয়োজিত করল। ফলে তার দ্বারা বাদশাহীর পরিবর্তে জুতো পলিশের কাজ নেয়া হচ্ছে।

বাস্তবিকই একজন হক্কানী আলেম যিনি দীনের খিদমতেও নিয়োজিত আছেন তিনি আখেরাতেরও বাদশাহ, দুনিয়ারও বাদশাহ। একজন সত্যিকার আলেমে দীন যে দুনিয়াতেও শাহী যিন্দেগী যাপন করেন এটা সবাইকে বলে বোঝানো যাবে না। তবে তিনি যে পরকালেও বাদশাহী লাভ করবেন একদিন সেটা সবাই প্রত্যক্ষ করবে। একজন আলেমে দীনকে যদি আল্লাহ তা'আলা ইমামতির জন্যও কবুল করেন, আর হযরত থানবী রহ.-এর ভাষায় যদি মুয়াযযিনীর জন্যও কবুল করেন তাহলেও তিনি একজন ছোটখাটো বাদশাহ। যা হোক বলছিলাম, একজন অভিভাবক এই গলদ চিন্তাধারার কারণে সন্তানের মর্যাদার স্তর অনেক নিচে নামিয়ে দেন। সাধারণত একজন অভিভাবক তার আলেম সন্তানের পরবর্তী প্রজন্মকেও দীনদাররূপে দেখার আকাঙক্ষা লালন করেন। কিন্তু যিনি সন্তানের ব্যাপারে উল্লিখিত গলদ চিন্তাধারার শিকার হন, তিনি পরবর্ত প্রজন্ম তো দূরের কথা, নিজ সন্তানকেও হয়তো পুরোপুরি দীনদার দেখে যেতে পারেন না। কাজেই আমরা যারা আমাদের সন্তানকে এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়েছি তারা এই ভুলটি কিছুতেই করতে যাবো না। হ্যাঁ, আপনার সন্তানের দুনিয়াতে বলা-কওয়া ও চলা-ফেরার জন্য যতোটুকু বাংলা-ইংরেজীর প্রয়োজন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যথাযথ গুরুত্ব ও যত্নের সঙ্গে সেটুকুর ব্যবস্থা রেখেছে। এ ব্যাপারে আপানারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে এতোটা অসচেতন ভাববেন না যে, একজন শিক্ষার্থীর দুনিয়াবী জরুরত পূরণ করার জন্য যে পরিমাণ জেনারেল শিক্ষা প্রয়োজন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখছেন। সুতরাং সন্তানের জন্য এমন প্রতিষ্ঠানের খোঁজ করবেন না, যেখানে জেনারেল শিক্ষার সমন্বয় রয়েছে এবং সন্তানদের দ্বারা এ আকাঙক্ষাও করবেন না যে, তারা আলেমও হবে আবার সফল ব্যবসায়ী কিংবা ডাক্তারও হবে। এই হলো, একটি বিষয় যে, আমরা আমাদের চিন্তাধারা নির্ভেজাল রাখবো। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে খালেছ আলেমে দীন হিসেবে দেখার স্বপ্ন লালন করবো। কথার কথা, আপনার সন্তান যদি মুহাক্কিক হক্কানী আলেম হওয়ার পরও বিশুদ্ধ বাংলা না-ও বলতে পারে, কিংবা ভাষা-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে না-ও পারে তবুও আফসোস ও অনুশোচনার কিছু নেই। পক্ষান্তরে প্রমিত উচ্চারণে বাংলা ভাষায় সাবলীল ভাষণ দিতে পারে, ব্রিটিশ উচ্চারণে ইংরেজী ভাষায় অনর্গল লেকচার দিতে পারে, কম্পিউটারের সফটওয়্যার তৈরি করতে পারে কিন্তু সে মুহাক্কিক আলেম হতে পারল না, একটা আয়াত-হাদীসের বিশুদ্ধ তরজমা করতে সক্ষম হলো না, একটা জটিল মাসআলার সঠিক সমাধান দিতে পারল না তাহলে কী লাভ হলো?

০২. সন্তানকে আলেম বানানোর জন্য শর্টকোর্স সিলেবাস নির্বাচন করা।

গ্রহণযোগ্য শর্টকোর্স মূলত দুই ধরণের। একটা হলো মেয়েদের দীনী শিক্ষার উপযোগী। আরেকটা হলো বয়স্কদের দীন শেখার উপযোগী। বাস্তবতার নিরিখে এই দুই শ্রেণীর লোকের জন্য সিলেবাস সংকোচন করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কিছু লোক জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই শর্টসিলেবাস ছেলে তালিবে ইলমদের উপরও প্রয়োগ করছে। ধরুন, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্য পাঞ্জাবী বানাতে আড়াই হাত বহরের তিন/সাড়ে তিন গজ কাপড় লাগে। এখন কেউ পাঞ্জাবী বানানোর জন্য দুই গজ কাপড় নিয়ে দর্জির কাছে গেল। তো তিন গজ কাপড়ের পরিবর্তে দুই গজ দিয়ে পাঞ্জাবী বানালে এটা কি আলেমে দীনের পাঞ্জাবী হবে, না গরুর ব্যাপারীর পাঞ্জাবী হবে? আলোচ্য ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি এমন ঘটেছে। আমাদের আকাবির বুযুর্গানে দীন আলেম হওয়ার জন্য দশ বছরের একটা নেসাব বা সিলেবাস প্রণয়ন করেছেন। এখন সেটাকে যদি ৩/৪ বছর কমিয়ে ৬/৭ বছরে নিয়ে আসা হয় তাহলে অনেক জরুরী কিতাবাদি বাদ দিতে হয়। উর্দূ বাদ দিয়ে দিতে হয়, ফার্সী বাদ দিয়ে দিতে হয়। বাংলা আর আরবী নিয়েই কোর্স সমাপ্ত করতে হয়। ঠিক যেমন তিন গজের পাঞ্জাবী যদি দুই গজ দিয়ে বানানো হয়, তাহলে হাতা শর্ট করতে হয়, পকেট বাদ দিতে হয় এবং নানা জায়গায় জোড়াতালি দিতে হয়। ব্যতিক্রম বাদে সিংহভাগ শর্টকোর্সের পরিণতিও তাই। সেখানে উর্দূ শিখতে হয় না, ফার্সী শিখতে হয় না, জরুরী অনেক কিতাবাদি বাদ দিতে হয়। আপনি যখন আপনার সন্তানকে পূর্ণাঙ্গ আলেমে দীন বানানোর আশা পোষণ করেছেন তাহলে কেন আপনি শর্টকোর্সের দারস্থ হবেন? কেন সন্তানকে আকাবিরের ইলম ও হিকমত থেকে বঞ্চিত করবেন? আপনার সন্তান যদি উর্দূ ভাষায় পারদর্শী না হয়, ফার্সী ভাষায় অবগত না হয় তাহলে সে কিভাবে আকাবিরে দেওবন্দের অনুসারী হবে? কেউ বলতে পারেন, আকাবিরে দেওবন্দের ইলমী ভাষা হিসেবে তাদের ইলম থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য উর্দূ না হয় শেখানো হলো কিন্তু ফার্সী কেন শেখানো হবে? এ ব্যাপারে আমাদের মুফতী সাহেব হুযূর সেদিনও বলছিলেন যে, যে ছেলেটি ফার্সী জানবে না সে উর্দূও জানতে পারবে না। কারণ, উর্দূভাষার এক-তৃতীয়াংশ হলো ফার্সী শব্দ, এক-তৃতীয়াংশ আরবী আর বাকিটা উর্দূর নিজস্ব শব্দ। এজন্য যে ফার্সী জানবে না সে উর্দূও পুরোপুরি জানতে পারবে না। দেখুন, যে সব মাদরাসায় ফার্সী পড়ানো হয় সেটা প্রয়োজন অনুপাতেই পড়ানো হয়। এমন না যে, এখান থেকে ছাত্রদেরকে শেখ সাদী বানিয়ে দেয়া হয়। বরং আকাবিরদের পংক্তিমালা, জালালুদ্দীন রুমী রহ.-এর আধ্যাত্মিক দর্শন, শেখ সাদী রহ.-এর জ্ঞানগর্ভ কাব্যসম্ভার, ফরীদুদ্দীন আত্তার রহ.-এর অমূল্য উপদেশমালা বোঝার জন্য যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকুই শেখানো হয়। এখন আপনার সন্তান যদি ফার্সী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তাহলে সে কিন্তু এক বিরাট রত্মভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল। কাজেই আপনি যখন আপনার সন্তানের জন্য তথাকথিত শর্টকোর্স সিলেবাস নির্বাচন করলেন আসলে আপনি তাকে প্রতিবন্ধি আলেম বানানোর প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেললেন। বলুন তো, কেউ কি তার সন্তানকে স্বেচ্ছায় শারীরিক প্রতিবন্ধি বানাতে পারে? পারে না। সন্তানকে শারীরিক প্রতিবন্ধি বানাতে রাজি না থাকলে তাকে প্রতিবন্ধি আলেম

বানাতেও রাজি থাকা উচিত নয়। দেখুন, শর্টকোর্সকে আমরা অবাঞ্চিত মনে করি না। বরং স্কুল-কলেজ থেকে আসা বয়স্ক তালিবে ইলমের জন্য এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী মনে করি। কিন্তু যে ছেলেদের শিক্ষাজীবনের সূচনাই মাদরাসা থেকে তাদের জন্য কোন অবস্থাতেই উপকারী মনে করি না।

শর্টকোর্সের মতো আরেকটি সমস্যা হলো, কোন কোন মাদরাসায় দুটি শ্রেণীকে একীভূত করে দশ বছরের সিলেবাসকে নয় বছরে করে দেয়া হয়। আপনার সন্তান কখনও আপনার কাছে এ ধরণের অজুহাত বা আব্দার নিয়ে অন্য মাদরাসায় ভর্তি হতে চাইলে আপনি তাকে বারণ করবেন। মনে রাখতে হবে, এক বছরের সংকোচনে আপনার সন্তান প্রায় আট/নয়টি কিতাব পড়া হতে বঞ্চিত হচ্ছে। আপনি কিছুতেই তা মেনে নিবেন না।

০৩. সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত সুধারণা পোষণ করা।

সন্তানের প্রতি অতি সুধারণা পোষণ করবেন না। সন্তান তো আর নিজের নফস ও সত্তার চেয়ে আপন নয়। অথচ আমাদেরকে নিজের নফসের প্রতিই সুধারণা পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই সন্তানের সব কথা বিশ্বাস করবেন না। সন্তান অনেক সময় বলবে, মাদরাসার খানা-পিনা ভালো নয়, অমুক শিক্ষকের আচরণ সঠিক নয়, অমুক ব্যাপারে সীমাহীন কড়াকড়ি হচ্ছে ইত্যাদি। সন্তানের এসব কথা বিনা যাচাইয়ে আমলে নেয়া যাবে না। সন্তান এ জাতীয় অভিযোগ করলে আপনি তাকে প্রথমেই সান্ত্বনা দিয়ে দিবেন যে, দ্যাখো! আলেম হতে হলে এতোটুকু কষ্ট-মুজাহাদা করতেই হয়। অতঃপর তার কথা বিবেচনাযোগ্য মনে হলে নেগরান উস্তাদ কিংবা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানবেন যে, তার এসব অভিযোগের সত্যতা কতোটুকু। অনেক সময় দায়িত্বশীল শিক্ষক আপনার সন্তানের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে আপনার নিকট সন্তানের ব্যাপারে কোন রিপোর্ট পেশ করেন, যাতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তার সংশোধন হয়ে যায়। কিন্তু দেখা যায়, অভিভাবকগণ শিক্ষকের কথার পরিবর্তে সন্তানের কথা বিশ্বাস করেন। এটা একটা আত্মঘাতি ব্যাপার। আপনি আপনার সন্তানের শিক্ষকের রিপোর্টকে কেন ভুল মনে করছেন। শিক্ষকগণ কখনই আপনার সন্তান কিংবা আপনার অকল্যাণ কামনা করে না। মনে করতে হবে, শিক্ষকগণ অপারগ হয়েই আপনার নিকট অভিযোগটি পেশ করেছেন। কাজেই এর বিহিত কিভাবে করা যায় আপনি সেটা নিয়ে ফিকির করবেন। উল্টোটা করা যাবে না।

০৪. ঘরে ও বাসায় পেপার-পত্রিকা পড়ার সুযোগ রাখা এবং ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহারের সুযোগ দেয়া।

সন্তানের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল করার স্বার্থে বাসা-বাড়িতে দৈনিক পত্রিকা রাখবেন না। আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অফিস-আদালতে কিংবা বাইরে কোথাও থেকে পড়ে আসবেন। বাসা-বাড়িতে পেপার-পত্রিকা নিয়ে যাবেন না। কারণ বর্তমানের পেপার-পত্রিকায় খাদ্যের চেয়ে অখাদ্য বেশি থাকে। বিনোদন পাতা, খেলাধুলার পাতা ইত্যাদি যতোসব ফালতু জিনিস দিয়ে ঠাসা থাকে। আর এগুলোর প্রতি থাকে বাচ্চাদের তীব্র আকর্ষণ। আপনি যদি ঘরে এসব অবাঞ্চিত জিনিস রাখেন তাহলে আপনার সন্তান ছুটিতে বাসায় গিয়ে এগুলোতে মত্ত হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে পেশাগত কারণে আপনি যদি ইন্টারনেট ব্যবহারে বাধ্য হন তাহলে নিজে তো সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করবেন কিন্তু সন্তানদেরকে এগুলোতে হাত দেয়ার কোন সুযোগ দিবেন না। আমাদের এক সিনিয়র ভাই, বর্তমানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তিনি তার মোবাইলে সব সময় জটিল সব পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখেন। অনেক সময় নিজেই সেই পাসওয়ার্ড ভুলে যান। জিজ্ঞেস করলাম, এটাকে এতোটা জটিল করে রেখেছেন কেন? বললেন, সন্তানদের সুরক্ষার জন্য; তারা যেন কিছুতেই এটা ব্যবহারের সুযোগ না পায়। সুতরাং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যদি নেট বা ওয়াইফাই ব্যবহার করতেই হয় করুন, কিন্তু সন্তানদেরকে সতর্কতার সঙ্গে এগুলো থেকে দূরে রাখতে হবে।

০৫. দুনিয়াদার কিংবা দীনের বুঝ কম এমন আত্মীয়-স্বজনের বাসায় সন্তান নিয়ে বেড়াতে যাওয়া।

এ ধরণের আত্মীয়-স্বজন আপনার বাসায় আসলে আপনি তাদের সঙ্গে সন্তানকে একাকী ছাড়বেন না, সন্তানের পাশে থাকবেন। যাতে তাদের কোন কুমন্ত্রণা, মন্দ-স্বভাব কিংবা দুনিয়াবী চিন্তাধারা দ্বারা আপনার সন্তান প্রভাবিত না হয়। অনুরূপভাবে দুনিয়াদার-দীনদার কোন আত্মীয়-স্বজনের বাসায় সন্তানকে কখনও একাকী বেড়াতে পাঠাবেন না। প্রয়োজনে আপনি নিজে এবং সন্তানের মা-সহ নিয়ে যাবেন। নিজেদের যাওয়ার সুযোগ না হলে প্রয়োজনে বেড়ানোটাই বাদ দিয়ে দিবেন। তবুও দীনী পরিবেশ নেই এমন আত্মীয়-স্বজনের বাসায় সন্তানকে নিয়ে যাবেন না।

০৬. সন্তানের পড়ালেখা ও আদর-শাসনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়ের একমত না হওয়া।

কোন ব্যাপারে কঠোর হতে হলে দুজনেই কঠোর হবেন। আর কোন ব্যাপারে নরম হতে হলে দুজনেই নরম হবেন। একই ব্যাপারে একজন শিথিল আর অপরজন কঠোর এমন যেন না হয়। শিক্ষার্থী ছেলে হোক আর মেয়ে অভিভাবককে অবশ্যই ঠিক করে নিতে হবে যে, এই সন্তানের পড়াশোনা ও আদর-শাসনের ব্যাপারে কার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। দেখা যায়, একজন ছেলে বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাকে উপরের শ্রেণীতে ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে পিতা ছেলের প্রতি অত্যন্ত নারায যে, কেন সে ঠিকমতো পড়াশোনা করল না। কাজেই আমি আর ওর জন্য শিক্ষকদের নিকট সুপারিশ করতে যাবো না। পিতার এই অসন্তুষ্টির কারণে মায়ের উচিত ছিল ছেলেকে বোঝানো যে, ঠিকমতো পড়াশোনা না করার কারণে তোমার পিতা খুব রেগে আছেন। তুমি যেভাবেই হোক তাকে রাজি করিয়ে শিক্ষকদের কাছে নিয়ে যাও। কিন্তু দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে ছেলের মা নিজেই শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, ভর্তি করে নেয়ার জন্য এর-তার কাছে ধর্না দিচ্ছেন। এর ফলে সন্তান মনে করবে, আমার মা-টা খুব ভালো আর বাপটা বেজায় বদরাগী। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে ধরে নিতে হবে, এই সন্তানের মানুষ হওয়া সহজ নয়। যে সন্তান মনে করবে, পিতা-মাতার একজন তার হিতাকঙ্ক্ষী আর অপরজন শত্রু কিংবা একজন তার পক্ষ আর অপরজন প্রতিপক্ষ এমন সন্তানকে মানুষ করা অত্যন্ত কঠিন। এক্ষেত্রে মায়ের উচিৎ ছিল সন্তানকে তার পিতার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা, নিজে পিতার ভূমিকা পালন না করা। কিন্তু আজকাল অনেক মা এই ব্যাপারে ভুল পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। এর থেকে বিরত থাকতে হবে এবং পিতা-মাতা উভয়ে একই নীতিতে চলতে হবে, দ্বিমুখী নীতি পরিহার করতে হবে।

শিক্ষার্থীর দ্বারা সংঘটিত কারণ

০১. শিক্ষার্থী নিজেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন।

কথার কথা, একজন শিক্ষার্থী ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ মাদরাসা নিযামিয়ায় অধ্যয়ন করছে। বছরের শুরুতে অভিভাবককে গিয়ে বলছে যে, এ বছর সে (উদাহরণস্বরূপ) জামি'আ রাহমানিয়ায় ভর্তি হবে। অভিভাবক জানে, বর্তমানে সে যে মাদরাসায় আছে সেটি ভালো মাদরাসা আবার জামি'আ রাহমানিয়াও ভালো মাদরাসা। জিজ্ঞেস করা হলো, এই সিদ্ধান্ত কেন নিলে? বলল, শুনেছি রাহমানিয়া খুব ভালো মাদরাসা। ঠিক আছে, রাহমানিয়া ভালো মাদরাসা কিন্তু নিযামিয়া ছেড়ে রাহমানিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তোমাকে কে দিল? হ্যাঁ, খোদ নিযামিয়াই যদি তাকে কোন কারণে প্রত্যাখ্যান করে কিংবা নিযামিয়ারই কোন অভিজ্ঞ শিক্ষক তার জন্য রাহমানিয়াকে বেশি উপযোগী মনে করে, অথবা হিতাকাঙ্ক্ষী কোন বিশিষ্ট আলেমে দীন এই পরামর্শ দেয় তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। অন্যথায় শুধু শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পছন্দের ভিত্তিতে কখনও তার প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করা যাবে না। নচেৎ দেখা যাবে, নিযামিয়া থেকে রাহমানিয়ায় এসে দুই বছর পড়ার পর আবার সে প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের আব্দার জানাচ্ছে। এভাবে সে সময়ের আগেই 'মুস্তাকিল বিয্যাত' (অকালপক্ক) হয়ে যাবে। একজন শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য এটা চরম প্রতিবন্ধক।

এভাবে নিজের পছন্দ মতো প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের ফলে সে কোন প্রতিষ্ঠানেরই ভালো বিষয়গুলো ধারণ করতে পারবে না। কোন প্রতিষ্ঠানের স্পেশালিটি ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করার জন্য দীর্ঘ সময় সে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও মুরুব্বীদের সোহবতে থাকতে হয়। ঘন ঘন প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনকারী শিক্ষার্থী এর থেকে বঞ্চিত হয়।

০২. বন্ধু-বান্ধব নিয়ে চলা-ফেরার অভ্যাস

একজন শিক্ষার্থীর বিপথগামী হওয়ার এটা সবচেয়ে বড় কারণ। হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. অনেক বড় মাপের আলেম ছিলেন। তাঁর পিতাও ছিলেন অনেক বড় মাপের আলেম। শাইখুল হাদীস ছাহেব রহ. লিখেছেন, ছাত্র যামানায় তার পিতার নির্দেশ ছিল, তিনি যেন পরপর দুই ওয়াক্ত নামায একই সহপাঠীর পাশে দাঁড়িয়ে না পড়েন। পিতার এই নির্দেশনার প্রতি তিনি খুব যত্নবান থাকতেন। কিন্তু সতর্কতা সত্ত্বেও ঘটনাক্রমে যদি একই সহপাঠীর পাশে দাঁড়িয়ে পরপর দুই ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন তাহলে তার পিতা তাকে শায়েস্তা করতেন। আমি তো দাঁড়াইনি সে এসে দাঁড়িয়েছে এটা বলেও রেহাই পেতেন না। তার পিতা বলতেন, ঠিক আছে তুমি দাঁড়াওনি কিন্তু সে কেন তোমার পাশে এসে দাঁড়াল, নিশ্চয়ই তোমার কোন কাজের কারণে সে উৎসাহ পেয়েছে। শাইখুল হাদীস ছাহেব রহ. তার আত্মজীবনীতে অনেক বার একথা লিখেছেন যে, যে শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বের রোগ বাসা বাঁধে সে কখনও কামিয়াব হয় না। এজন্য অভিভাবক হিসেবে আপনাকে নজরদারী করতে হবে যে, আপনার সন্তানের মধ্যে বন্ধুত্বের রোগ দানা বেঁধেছে কিনা। শুরুতেই এটাকে উৎপাটন না করা হলে একসময় দেখা যাবে, সে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাদরাসার আইনবিরোধী নানা রকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। গোপনে মোবাইল ব্যবহার করছে, কারও বাসায় গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে ইত্যাদি। এজন্য পিতা-মাতাকে অভিভাবকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সন্তানের বন্ধুত্বের ঘাটতিও পূরণ করতে হবে। নিজেদেরকেই সন্তানের বন্ধু বনে যেতে হবে। দায়িত্বের খাতিরে সন্তানের প্রতি প্রয়োজনীয় কঠোরতা তো অবশ্যই থাকবে কিন্তু উপযোগী ক্ষেত্রগুলোতে সন্তানের প্রতি হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণও করতে হবে। পড়াশোনায় ভালো করলে মৌখিকভাবে শুকরিয়া জ্ঞাপনের পাশাপাশি সাধ্য অনুযায়ী তার পছন্দের খানাপিনার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন কারণে ফলাফল খারাপ করলে তিরস্কারের পাশাপাশি সামনে ভালো করার জন্য সাহস যোগাতে হবে। মোটকথা সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কটা এতোটুকু খোলামেলা রাখতে হবে, যাতে সে কোন অন্যায় করে ফেললেও বন্ধুদের দারস্থ না হয়ে পিতা-মাতার সহযোগিতা কামনা করতে পারে। এভাবে সন্তানকে অবাঞ্ছিত বন্ধুত্বের মোহ থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে।

০৩. মাদরাসার পাঠ্যসূচী ও মাদরাসার অনুমোদিত কার্যক্রম বহির্ভূত বিষয়ে আগ্রহ।

শিক্ষার্থীদের ইতিহাস জানার জন্য মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া, খেলাফতে রাশেদা প্রভৃতি গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত আছে। দেখা গেলো, আপনার সন্তান ছুটিতে বাসায় যাওয়ার পর মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়, আহমদ শাহ আবদালীর ভারত অভিযান ইত্যাদি বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। এটা ভালো লক্ষণ নয়। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন, তুমি যে বইটি পড়ছো, এটা পড়ার জন্য তোমার নেগরান উস্তাদের পক্ষ হতে অনুমোদন আছে কিনা? এটা অনস্বীকার্য যে, পাঠ্যসূচীর পাশাপাশি পড়াশোনায় সহায়ক কিছু বই-পত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেটা শিক্ষার্থীর মেধা-বয়স-সময় ইত্যাদি বিবেচনায় নির্বাচন করে দিবেন তার নেগরান তথা শ্রেণী-তত্ত্বাবধায়ক। শিক্ষার্থী নিজে নিজে এগুলো বাছাই করতে পারবে না। অতএব আপনি যদি দেখেন, আপনার সন্তান আকাবিরে দেওবন্দ যথা হযরত থানবী রহ., শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ., মুফতী শফী রহ., হাফেজ্জী হুযূর রহ., শামছুল হক ফরিদপুরী রহ., আলী নাদাবী রহ., তাকী উসমানী দা.বা. কিংবা আমাদের মাদরাসার কোন উস্তাদের লেখা বই অধ্যয়ন করছে তাহলে বুঝে নিবেন সে সঠিক পথে আছে। আকাবিরে দেওবন্দের বাইরের কারও লেখা বই চাই সেটা যতোই ভালো হোক এবং বিশেষত গল্প-উপন্যাস ও সাহিত্যের বই পড়তে দেখলে অবশ্যই বিরত রাখবেন, কিছুতেই সুযোগ দিবেন না। কারণ, এগুলো তার চিন্তা-ভাবনা বিক্ষিপ্ত করে ফেলবে। কেউ সাহিত্যিক হোক, ইতিহাসবিদ হোক এতে আপত্তির কিছু নেই কিন্তু তার আগে তাকে মজবুত আলেম হতে হবে। মজবুত আলেম হয়ে সাহিত্যিক হলে, ইতিহাসবিদ হলে তার সাহিত্য ও ইতিহাসজ্ঞান জাতির কাজে আসবে। পক্ষান্তরে মজবুত আলেম না হয়ে সাহিত্যিক হলে তার এই সাহিত্য কার কোন্ কাজে লাগবে? এজন্য সন্তানকে মাদরাসার পাঠ্যসূচীর বাইরের কোন ভালো বই পড়তে দেখলেও জিজ্ঞেস করতে হবে, নেগরান উস্তাদের পক্ষ হতে তার জন্য এই বই পড়ার অনুমতি আছে কিনা? প্রয়োজনে নেগরান উস্তাদকে ফোন করে সত্যটা জেনে নিতে হবে; শুধু সন্তানের কথার উপর নির্ভর করা চলবে না। নেগরান উস্তাদের কথা এজন্য বলা হচ্ছে যে, একজন ছাত্রের পড়াশোনাসহ তার সার্বিক যোগ্যতা সম্পর্কে নেগরান উস্তাদ অবহিত থাকেন। সে হিসেবে নেগরান উস্তাদ অনেক সময় নির্দিষ্ট ছাত্রের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অনুমোদিত বইগুলোও পড়া সমীচীন মনে করেন না। সুতরাং এ ব্যাপারে নেগরানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

০৪. তথাকথিত ইসলামী সঙ্গীত শোনা বা শেখার প্রতি আগ্রহ।

ইসলামী সঙ্গীতের নামে উদ্ভট এক জিনিস সমাজে চালু হয়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের

বর্ণনা অনুযায়ী, সেগুলোর কথা হয়তো ভালো কিন্তু সুর-তাল-লয় প্রস্তুত সবকিছু হয় নিষিদ্ধ সঙ্গীতের আদলে। বলুন! গানের আদলে তৈরি করা জিনিস কিভাবে ইসলামী হয়? মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বড় একটা অংশ এর পেছনে পড়ে বরবাদ হয়ে গেছে। এই হতাভাগাদের জীবনের লক্ষ্যই হলো নতুন নতুন সঙ্গীতের অ্যালবাম বানানো, মেকআপ মেখে রঙ-ঢঙ করে শুটিং করা ইত্যাদি। ফাসেক-ফাজেরদের শুটিং আর এদের শুটিংয়ের মধ্যে নাকি পার্থক্য কেবল পোষাকে। ওরা প্যান্ট-শার্ট পরে এগুলো করে আর এরা দাড়ি-টুপি, জুব্বা-বোরখার বদনাম করে। অন্যথায় যন্ত্রপাতি, অঙ্গভঙ্গি, স্থান নির্বাচন ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে দুটো একই জিনিস। আল্লাহর পানাহ! এগুলো নাকি ইসলামী সঙ্গীত। যাই হোক, এগুলোতে ইসলামের কোন কিছু না থাকলেও আমাদের ছেলে-মেয়েরা এগুলোর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। কাজেই এগুলোর প্রতি আমরা নিজেরাও আগ্রহী হবো না আর সন্তানদেরকেও এগুলোতে লিপ্ত হতে দিবো না। এমনকি কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতও যদি গানের সুরে করা হয় সেটাও করা-শোনা জায়েয নেই। হাদীসে পাকে এসেছে– মাফতূনাতুন কুলূবুহুম....

অর্থ: যারা গানের সুরে কুরআনের কারীমের তিলাওয়াত করে তাদের অন্তরও ফিতনায় নিপতিত আর যারা তা পছন্দ করে তাদের অন্তরও ফিতনায় নিপতিত।

গানের সুরে কৃত খোদ কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতই যদি ফিতনার কারণ হয় তাহলে হামদ-নাত, গজল-সঙ্গীত এগুলোর ব্যাপারে বিধান কি হবে সহজেই অনুমেয়।

০৫. জ্বালাময়ী ভাষণ-বক্তৃতার প্রতি আগ্রহ।

আপনার সন্তান বিবেচনাহীন জ্বালাময়ী বক্তৃতা শোনতে আগ্রহী কিনা। যে ভাষণ-বক্তৃতা মুহূর্তেই হৃদয় ও শরীরে জোশ-জ্বালা সৃষ্টি করে কিন্তু সেই জোশ ও জ্বালা প্রশমনের প্রয়োগক্ষেত্র বাস্তবে বিদ্যমান নেই এর প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগ শিক্ষার্থীকে অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়। সুতরাং এ ব্যাপারেও একজন সচেতন অভিভাবককে সতর্ক থাকতে হবে। এ ধরণের জ্বালাময়ী বয়ান-বক্তৃতা স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রয়োজন আছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব ভাষণ-বক্তৃতা দীনের চাহিদা অনুযায়ী হয় না। একেবারে গ্রাম-গঞ্জের মাহফিলগুলোতে যেখানকার শ্রোতারা দীনের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কেই অনবহিত সেখানে মাঠগরম করা বক্তৃব্য দেয়ার উদ্দেশ্য কী? আল্লাহই ভালো জানেন, এরা দীনের শান বৃদ্ধি করে নাকি নিজেদের শান বৃদ্ধি কামনা করে! বয়ান-বক্তৃতার এই পদ্ধতিটি যে ইশাআতে দীনের জন্য খুব একটা উপকারী নয়, তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং আমার সন্তান যেন এসবের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় না যায়, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

০৬. সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হওয়া।

আপনার সন্তান গোপনে গোপনে কোন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত কিনা সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। ছাত্রসংগঠন, পাঠাগার, কল্যাণ সমিতি, মাল্টিপারপাস ও মাল্টিলেভেল মার্কেটিং কোম্পানী ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থাকলে বা এগুলোর প্রতি আগ্রহী থাকলে তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করতে হবে। নিজ এলাকায় দীনী মেহনত করার জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য দাওয়াতুল হক ও দাওয়াত-তাবলীগের কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছেন বরং এই দুই পদ্ধতিতে মেহনত করার তাগিদ দিয়ে থাকেন। সুতরাং শিক্ষাগ্রহণকালীন জনসাধারণের মধ্যে দীনের খেদমত করতে হলে ছুটিগুলোতে হয়তো তাবলীগে বের হবে, অন্যথায় এলাকায় গিয়ে দাওয়াতুল হকের তরযে দীন যিন্দা করবে। ছাত্র অবস্থায় এর বাইরে কোন পন্থায় দীনী খিদমতের অনুমতি রাহমানিয়ার ছাত্রদের নেই। কাজেই আপনি যদি আপনার সন্তানকে এই দুই পদ্ধতিতে দীনের মেহনত করতে দেখেন, বুঝে নিবেন সে সঠিক পথে আছে।

০৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আগ্রহ।

হাফেজ সন্তানের ইয়াদ যদি ভালো হয় এবং কণ্ঠও যদি সুললিত হয় তাহলে বিভিন্নজন তাকে নানা রকম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পরামর্শ দিবে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে এই কাজটি সন্তানের শিক্ষকও করে থাকেন। সেসব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যই থাকে ছাত্রদেরকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়ে পুরস্কার অর্জন করা এবং নাম কামানো। এর দ্বারা সন্তানের পাশাপাশি হয়তো আপনারও সুনাম হবে, পেপার-পত্রিকায় ছবি আসবে, বড় অংকের আর্থিক প্রাপ্তিও ঘটবে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরূপ হাফেযরা ভালো আলেম হওয়ার তাওফীক পায় না। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো তার প্রতিযোগিতার পেছনেই কেটে যায়। সুতরাং আপনার সন্তান যেন প্রতিযোগিতামুখী না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখবেন। হ্যাঁ, যেসব প্রতিযোগিতা ছাত্রদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি উৎসাহ ও উদ্যম সৃষ্টি করে সেগুলোর ব্যবস্থা এখানকার শিক্ষকগণ মাদরাসার অভ্যন্তরেই করে থাকেন। কাজেই বাইরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কোনও প্রয়োজন নেই।

দুই. সন্তানের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা।

০১. মাদরাসা থেকে শিক্ষার্থীর উপযোগী যে পোশাক-পরিচ্ছদ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে বাসা-বাড়িতে যাওয়ার পরও তা বিদ্যমান থাকে নাকি এর মধ্যে পরিবর্তন আসে তা খেয়াল রাখা।

জামি'আ রাহমানিয়ার শিক্ষার্থীদের পাঞ্জাবী কল্লিদার হওয়া, ঝুল কমপক্ষে হাঁটুর চার আঙ্গুল নিচে থাকা এবং ঢিলাঢালা হওয়া জরুরী। অ্যামব্রয়ডারীযুক্ত, নেট-ঘুন্টি বিশিষ্ট, একছাটা এবং একাধিক রঙের ডোরা বা ডিজাইনযুক্ত পোশাক নিষিদ্ধ। গেঞ্জীর ক্ষেত্রে লেখা ও ছবিবিহীন হওয়া এবং হাফহাতা বা ফুলহাতা হওয়া জরুরী। টুপির ক্ষেত্রে পাঁচকল্লি হওয়া জরুরী। পায়জামা ঢিলেঢালা হওয়া এবং পায়জামা-লুঙ্গী টাখনুর উপরে পরিধান করা জরুরী। স্যান্ডো গেঞ্জী, পাঁচকল্লি ব্যতীত অন্য ডিজাইনের টুপি, চোস্ত পায়জামা, আলীগড়ী পায়জামা গ্রহণযোগ্য নয়। অভিভাবকে লক্ষ্য রাখতে হবে, বাসায় যাওয়ার পরও তার সন্তানের পোশাক-পরিচ্ছদে এই বিষয়গুলো বিদ্যমান থাকে কিনা। যদি দেখেন বাসায় যাওয়ার পর সে অ্যামব্রয়ডারীযুক্ত পাঞ্জাবী, স্যান্ডো গেঞ্জী, ট্রাউজার, টাখনুঢাকা পায়জামা, ভিন্নরকম টুপি পরিধান করছে কিংবা টুপিবিহীন চলাফেরা করছে বুঝে নিবেন আপনার সন্তান মানসিকবিচ্যুতির শিকার; সে মাদরাসার তা'লীম-তরবিয়তে আগ্রহী নয়। সম্ভব হলে নিজেই সমাধানের চেষ্টা করবেন অন্যথায় নেগরান উস্তাদের সহায়তা গ্রহণ করবেন।

মাদরাসা থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য যে ধরণের পোশাক নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এ ধরণের পোশাক যদি একজন সাধারণ দীনদার ব্যক্তিও ধারণ করে তাহলে দর্শক তাকে আলেমে দীন বা মাদরাসার শিক্ষক মনে করবে। পক্ষান্তরে একজন আলেমে দীনও যদি ডিজাইন করা রঙচঙে পোশাক, ভিন্ন ডিজাইনের

টুপি এবং চোস্ত পায়জামা পরিধান করেন তাহলে দর্শক তাকে ব্যবসায়ী, হাইস্কুলের শিক্ষক ইত্যাদি মনে করবে, কিছুতেই আলেম মনে করবে না। বোঝা গেলো, যে পোশাক পরিধান করলে সাধারণ মানুষকেও আলেমে দীন মনে হয় সেটা আলেমদের পোশাক, আর যে পোশাক আলেমে দীনকেও সাধারণ হিসেবে তুলে ধরে সেটা আলেমদের পোশাক নয়। একথার অর্থ এই নয় যে, অন্য ধরণের পোশাক পরিধান করা অবৈধ বা না-জায়েয। এগুলো পরিধান করা অবশ্যই জায়েয কিন্তু এগুলো আলেমদের পোশাক নয়। আপনি আপনার সন্তানকে আলেম বানানোর জন্যই মাদরাসায় দিয়েছেন। কাজেই তার পোশাক-পরিচ্ছদও যেন আলেমানা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আপনার কর্তব্য।

০২. বাসা-বাড়িতে যাওয়ার পর সন্তানের 'সঙ্গ'-এর প্রতি নজর রাখা।

ছুটিতে বাসায় যাওয়ার পর আপনার সন্তান স্বাভাবিকভাবেই খালাতো-চাচাতো ভাই এবং প্রতিবেশী ছেলেপেলেদের সঙ্গে উঠা-বসা ও খেলাধূলা করবে। খেয়াল রাখতে হবে, এদের মধ্যে যারা ভালো ও সৎ আপনার সন্তান তাদের সঙ্গ পছন্দ করে নাকি মন্দ ও অসৎ ছেলেদের সঙ্গ পছন্দ করে। সৎসঙ্গ অবলম্বন করলে তো ভালো অন্যথায় সন্তানকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগে বাধ্য করতে হবে। অসৎ ছেলেগুলোকে বলে-কয়ে নামাযে নিয়ে আসা এবং তাদেরকে দীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা তো ভালো কথা, কিন্তু দেখা গেলো আপনার সন্তান নিজেই তাদের সঙ্গে বেহুদা আড্ডাবাজিতে লিপ্ত, মোবাইল দেখায় বা ক্রিকেট খেলায় মত্ত, নামায-কালামের খবর নেই। ব্যস, কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনুন, ফালতু মেলামেশা বন্ধ করে দিন। প্রয়োজনে নেগরানের সহায়ন নিন। মাসের পর মাস মাদরাসার পরিবেশে থেকে অর্জিত সৎ গুণাবলী কয়েকদিনের অসৎসঙ্গ ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

০৩. মোবাইল বা ট্যাব ব্যবহার করছে কিনা নজর রাখা।

মোবাইল বিষধর সাপের চেয়েও বিষাক্ত বস্তু। এর বিষ যার হজম করার সক্ষমতা নেই তার ধ্বংস অনিবার্য। ছোবল ও প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে সাপের বিষ থেকে উপকৃত হওয়া যেমন কঠিন মোবাইল থেকেও নিরাপদে উপকৃত হওয়া তেমন কঠিন। প্রতিষেধক প্রস্তুতের অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া যেমন কেউ সাপের বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করে না তেমনই অতীব প্রয়োজন ছাড়া মোবাইলও ব্যবহার না করা। একজন শিক্ষার্থীর জন্য পিতা-মাতার সঙ্গে জরুরী কর্থাবার্তা বলা ছাড়া মোবাইল ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই। মাদরাসার অভ্যন্তরে এই প্রয়োজন পুরা করার জন্য নেগরানের মোবাইল কিংবা প্রতিটি শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত ল্যান্ডফোনই যথেষ্ট। আর বাসা-বাড়িতে থাকাকালীন সে তো পিতা-মাতার সঙ্গেই থাকে সুতরাং বাসা-বাড়িতে শিক্ষার্থীর মোবাইল ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই। আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্পর্কে অবগতি লাভ, ইসলামের শত্রুদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ এগুলো শিক্ষার্থীর দায়িত্ব নয়। এসব অজুহাতেও সন্তানকে মোবাইল ব্যবহার করতে দিবেন না। অভিভাবক যদি এ ব্যাপারে সচেতন না হোন, সন্তানের আবদার ও পীড়াপীড়ির কারণে তাকে মোবাইল ব্যবহার করতে দেন, কিংবা তাকেই একটা মোবাইল কিনে দেন তাহলে এর ভয়াবহ পরিণতি একসময় সন্তানের পাশাপাশি আপনাকেও ভোগ করতে হবে।

০৪. অভিভাবকবিহীন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘুরতে যাওয়া প্রতিরোধ করা।

সন্তান ছুটিতে বাড়িতে গেছে। কয়েক ঘণ্টা যাবৎ তাকে দেখা যাচ্ছে না। সন্তানের মাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, সে কক্সবাজার বা কুয়াকাটা ঘুরতে গেছে। কার সঙ্গে গেছে? সহপাঠীদের সঙ্গে। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এভাবে অভিভাবকহীন ঘোরাঘুরি বিলকুল বরদাশত করবেন না। সন্তানের আব্দার রক্ষার্থে প্রয়োজনে আপনি নিজে তাকে কক্সবাজার ঘুরিয়ে আনুন। অভিভাবক ছাড়া একাকী ঘুরতে গেলে শিক্ষার্থীরা এমন সব কাজে জড়িত হয় যা দীনবিমুখ লোকজন করে থাকে। সারা বছর মেহনত করে শিক্ষকগণ তার মধ্যে যে মেজায ও রুচিবোধ তৈরি করেছিলেন একবার ঘুরতে গিয়ে সে স-ব নষ্ট করে আসবে। এজন্য এ ব্যাপারেও সতর্ক থাকবেন।

০৫. খেয়াল রাখা সন্তান অস্বাভাবিক পরিমাণ টাকা-পয়সার আব্দার করে কিনা।

অনেক সময় সন্তান আপনার কাছে নিয়মিত খরচ ছাড়াও বিভিন্ন অজুহাতে টাকা-পয়সার চাহিদা জানাতে পারে। সামর্থ্য থাকলেও এই চাহিদা পূরণ করার জন্য আপনি তার হাতে নগদ টাকা-পয়সা দিবেন না। তাকে বলবেন, তোমার কী প্রয়োজন স্পষ্ট করে বলো, আমি ব্যবস্থা করছি। চাহিদা শোনার পর যদি বাস্তবেই জিনিসটি তার প্রয়োজনীয় মনে হয় তাহলে নিজে তা সংগ্রহ করে দিবেন। তা না করে আপনি যদি তার হাতে নগদ টাকা-পয়সা প্রদান করেন তাহলে সে এখান থেকে টাকা বাঁচিয়ে মোবাইল কিনতে পারে, ঘুরতে যেতে পারে, বন্ধুদের সঙ্গে হাতেমতাই-গিরি করতে পারে। আমাদের এখানকারই এক ছাত্র সেদিন বলল, সে উমরার জন্য টাকা জমাচ্ছে। এ পর্যন্ত কত হয়েছে? বলল, একুশ হাজার। বললাম, তুমি এখন ছাত্র মানুষ। তোমার তো উমরার জন্য টাকা জমানোর প্রয়োজন নেই। ভালো আলেম হও, উমরা করে কুলোতে পারবে না। তো সে-তো তার বক্তব্য অনুযায়ী উমরার জন্য টাকা জমাচ্ছে। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তো এই টাকা দিয়ে মোবাইলও কিনতে পারে! তাছাড়া পিতা সামর্থ্যবান না হলে বিভিন্ন অজুহাতে এই অতিরিক্ত টাকা তার কাছ থেকে নেয়া তো জুলুমের নামান্তর। মোটকথা, সামর্থ্য থাকলেও নিয়মিত খরচ বহির্ভূত চাহিদা পূরণের জন্য সন্তানের হাতে নগদ টাকা-পয়সা প্রদান করবেন না। এটা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

তিন. ছুটিকালীন শিক্ষার্থীর তা'লীম-তরবিয়তের প্রতি খেয়াল রাখা।

০১. ছুটিতে বাসায় থাকাকালীন সন্তানের তিলাওয়াত-নামায ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, অলস সময় কাটাচ্ছে কিনা, পিতা-মাতা ও বড়দের প্রতি বাধ্য ও শ্রদ্ধাশীল কিনা, ভাই-বোন ও সমবয়সীদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হচ্ছে কিনা, অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিসপত্রে হস্তক্ষেপ করছে কিনা ইত্যাদি ব্যাপারেও পিতা-মাতাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সংশোধনযোগ্য কিছু নজরে পড়লে সাথেসাথে সংশোধন করে দেয়া, প্রয়োজনে নেগরানের সহযোগিতা কামনা করা।

০২. ছুটি শেষে সন্তান যখন মাদরাসায় আসবে তখন সে সময়গুলো ভালো কিংবা মন্দ যেভাবেই কাটাক আপনি নেগরান উস্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। ভালোভাবে কাটালে বলবেন, মা-শাআল্লাহ সে এই ছুটিতে নামায-তিলাওয়াত ইত্যাদি সব ঠিকঠাক আদায় করেছে। অথবা এই এই ব্যাপারে অলসতা করেছে, তাকে সতর্ক করা দরকার।

০৩. অনুরূপভাবে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর নিজে মাদরাসায় এসে কিংবা ফোনে নেগরান উস্তাদের কাছ থেকে তার ফলাফল সম্পর্কে অবগত

হবেন। আগের পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে বর্তমান ফলাফলের তুলনা করে সন্তোষ-জনক হলে তাকে বাহ্বা দিবেন আর অসন্তোষজনক হলে কারণ জিজ্ঞেস করত সামনে ভালো করার জন্য সতর্ক করবেন।

চার. অন্যান্য সন্তানের তুলনায় দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তানের প্রতি বিশেষ কল্যাণের দৃষ্টি রাখা।

০১. দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তানের প্রতি বিশেষ কল্যাণকামিতার অন্যতম হলো, সন্তান যেন সারা বছর সব কটি ক্লাস উপস্থিত থাকে এ ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করা এবং সাহস যোগানো। সামান্য সামান্য অজুহাতে ক্লাস চলাকালীন সন্তানকে বাসায় নিয়ে যাওয়া তার প্রতি কল্যাণকামিতা নয়। এজন্য পারিবারিক অনুষ্ঠানাদির দিন-তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তালিবে ইলম সন্তানের ক্লাস, পরীক্ষা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রেখে তার ছুটিকালীন এগুলোর আয়োজন করবে। অপারগতা বশত ক্লাস চলাকালীন কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হলে প্রথমত তাকে এ ব্যাপারে জানাবেই না, আর জানানোর প্রয়োজন হলে তাকে বলে দিবে যে, অপারগতার কারণে অনুষ্ঠানটি এখনই করতে হচ্ছে, তোমার আসার প্রয়োজন নেই; তোমার জন্য খানা-পিনা রেখে দিচ্ছি অথবা তুমি আসলে তোমার জন্য আবার ব্যবস্থা করবো।

০২. পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাকে মূল্যায়ন করা। যেখানে সুযোগ আছে, তাকে ইমামতির জন্য আগে বাড়িয়ে দিন। সন্তান কুরবানীর সময় মাদরাসায় থাকবে, ঈদের দিন বাসায় আসতে পারবে না। একাধিক কুরবানী করার সামর্থ্য থাকলে আপনি একটি ছাগল বেশি ক্রয় করুন। ঈদের পরদিন সন্তান যখন মাদরাসা থেকে বাসায় আসবে, তাকে বলুন তোমার জন্য এবং তোমাকে দিয়ে কুরবানী করানোর জন্য এটি রেখে দিয়েছি। এতে সে কতোটা খুশি হবে, তার দিলটা কতো বড় হয়ে যাবে কল্পনা করুন। অনুরূপভাবে তার দীনী শিক্ষার ফযীলত, তার প্রতি আপনাদের স্বপ্ন বারবার তার সামনে উল্লেখ করুন। উদাহরণ স্বরূপ, তুমি অনেক বড় আলেম হবে, আখেরাতে আমাদের নাজাতের উসিলা হবে এটাই তোমার থেকে আমাদের কামনা। তোমার উপার্জিত অর্থ-সম্পদ দ্বারা উপকৃত হবো এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের নেই। এসব বলে বলে তাকে তার লক্ষ্যে অবিচল থাকতে সাহস যোগানো। অনুরূপভাবে বাসা-বাড়িতে ভালো কোন খানা-পিনার আয়োজন হলে যথাসম্ভব একটা অংশ তার জন্যও রেখে দেয়া। কথার কথা, বাড়িতে একটা মোরগ বড় হয়েছে। সেটাকে জবাই করার জন্য সন্তানের ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সে আসার পর তাকে বলুন, মেহমান তো অনেকেই এসেছিলেন, জবাই করার প্রয়োজনও ছিল কিন্তু তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। অনুরূপভাবে কাউকে কিছু দান করতে হলে যথাসম্ভব এই সন্তানের মাধ্যমে দান করুন।

০৩. সন্তানের জন্য উলামায়ে কেরামের নিকট দু'আ চান। সাধারণ দীনদারদের নিকটও দু'আ চান। শামছুল আইম্মা হালওয়ায়ী রহ. একজন মিষ্টি বিক্রেতার সন্তান ছিলেন। তার পিতা ক্রেতাদেরকে পাওনার চেয়ে কিছুটা বেশি দিতেন আর সন্তানের জন্য দু'আ চাইতেন। আল্লাহ তা'আলা পিতার দু'আ কামনার উসিলায় তাকে শামছুল আইম্মা (ইমামদের সূর্য) বানিয়ে দিয়েছেন। আজকাল সন্তানের এসএসসি পরীক্ষায় সফলতার জন্য কতো পিতা-মাতা দু'আর আয়োজন করে। যার সঙ্গে দেখা হয়, সন্তানের সাফল্যের জন্য দু'আ চায়। কিন্তু সন্তান ভালো আলেম হোক, দীনদার হোক এর জন্য তেমন দু'আ চায় না। আমরা এমন হবো না। আমরা আমাদের সন্তানের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে দু'আ চাইব, যাতে আল্লাহ তা'আলা আমার সন্তানটিকে হক্কানী রব্বানী আলেম বানিয়ে দেন।

০৪. সর্বশেষ আরজ, সন্তানের শিক্ষকদেরকে সম্মান করুন। তাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখুন। শিক্ষকগণ আপনার সন্তানের আলেম হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। পরিস্থিতি যা-ই হোক, কখনও তাদের সঙ্গে অভদ্রতাজনোচিত আচরণ করবেন না। কোন বিষয় সমালোচাযোগ্য হলেও সন্তানের সামনে কখনও এ ব্যাপারে মুখ খুলবেন না। আপনার সন্তান যে প্রতিষ্ঠানেই পড়াশোনা করুন, সম্ভব হলে তার শিক্ষকদের সঙ্গে বিশেষত নেগরান উস্তাদের সঙ্গে হাদিয়া-উপঢৌকন প্রদানের মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন। তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে সন্তানের পড়াশোনা আদব-আখলাক সর্ববিষয়ে পরামর্শ করুন।

যে কথাগুলো বলা হলো, আমরা যদি আন্তরিকভাবে এগুলো গ্রহণ করতে পারি, আশা করা যায় সন্তানের হক্কানী আলেম হওয়ার ব্যাপারে আমাদের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আল্লাহ তা'আলা তা পূরণ করবেন।

লেখক: নায়েবে মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

(২৮ পৃষ্ঠার পর; দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি)

(১৪) বিদেশী ঋণ গ্রহণে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।

(১৫) দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক কিংবা অলাভজনক মেগা প্রকল্পসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলে বন্ধ করে দেয়া এবং নতুন করে এ ধরণের প্রকল্প চালু না করা।

(১৬) রেমিটেন্স প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য রেমিটেন্স প্রেরণের আইনসম্মত প্রক্রিয়া সহজতর করে হুন্ডির প্রতি নিরুৎসাহিত করা।

(১৭) সংকটকালীন দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া এবং কঠোরভাবে তা মনিটরিং করা।

ব্যবসায়ীদের করণীয়:

(১) আল্লাহর ভয় ও পরকালীন জবাবদিহিতা অন্তরে জাগ্রত রাখা।

(২) সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের ফযীলত স্মরণ রাখা।

(৩) শরীয়তসম্মত পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা।

(৪) জনগণ বিশেষত মুসলমানদের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া।

(৫) অল্পপুঁজিতে অস্বাভাবিক লাভ করে রাতারাতি পুঁজিপতি হওয়ার ঘৃণ্য লালসা পরিত্যাগ করা।

(৬) মজুদদারী ও সিন্ডিকেট থেকে নিজে বিরত থাকা, অপরকে বিরত থাকতে উৎসাহ দেয়া।

(৭) সংকটকালীন নামমাত্র লাভে কিংবা বিনা লাভে পণ্য সরবরাহ করা।

জনসাধারণের করণীয়:

(১) গুনাহ ও পাপাচার ছেড়ে দেয়া।

(২) তাওবা ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা।

(৩) দু'আর ইহতিমাম করা।

(৪) সর্বাবস্থায় সবর অলম্বন করা।

(৫) আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা রাখা।

(৬) বিলাসী জীবন পরিহার করা।

(৭) লোভ-লালসা পরিত্যাগ করা এবং অল্পতুষ্টির জীবন অবলম্বন করা।

(৮) হালাল ও বৈধ উপায়ে সাধ্য অনুযায়ী রুটি-রুজির অন্বেষণে ত্রুটি না করা।

(৯) চাষাবাদযোগ্য জমি অনাবাদ ফেলে না রাখা।

(১০) মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা।

(১১) অপচয় ও অপব্যয় পরিত্যাগ করা। বিশেষত গুনাহের কাজে অর্থব্যয় না করা।

(১২) নিজ নিজ অধীনস্তদের প্রতি সাধ্য অনুযায়ী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া।

লেখক: খতীব, হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. জামে মসজিদ, মোহাম্মদী হাউজিং লিমিটেড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

বালা-মুসীবতের কারণ ও প্রতিকার

মুফতী হাসান সিদ্দীকুর রহমান দা.বা.

মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ.
অর্থ: তোমাদের উপর যে সব বিপদাপদ আপতিত হয় তা তোমাদেরই কর্মফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন। (সূরা শূরা; আয়াত ৩০)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন পুরো বিশ্বজগতকে বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি করেছেন এবং অত্যন্ত সুচারুরূপে এর পরিচালনা করছেন। মানবজাতির কল্যাণার্থে তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন সাধারণ ও বিশিষ্ট বহু নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলার সাধারণ ও ব্যাপক নেয়ামতরাজির মধ্যে আকাশ-বাতাস, আগুন-পানি, বৃষ্টি-মাটি প্রভৃতি অন্যতম। এগুলো এমনই নেয়ামত যার দ্বারা মানুষ সার্বক্ষণিক উপকৃত হয়। কিন্তু অনেক সময় এগুলো দ্বারাই মানুষ নানা রকম দুর্যোগ-দুর্বিপাকের শিকার হয়। অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকাণ্ড-বজ্রপাত, ভূমিকম্প-ভূমিধ্বস, বন্যা-খরা প্রভৃতি জনপদের পর জনপদ লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এতে প্রাণহানী ঘটে হাজার হাজার বনী আদমের। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফল-ফসল, ক্ষেত-খামার, গবাদি পশু। আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে বলছেন, এই যে বিভিন্ন রকম আসমানী ও যমীনী বালা-মুসীবত মানুষের জীবনে দেখা দেয় তা মানুষের বদ আমল ও মন্দ কর্মের দরুন দেখা দেয়; এতে আল্লাহ তা'আলার কোনও দোষ নেই। সুতরাং বালা-মুসীবতে নিপতিত হলে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে অভিযোগ ও আপত্তি তোলা মোটেই সমীচীন নয়। বরং কৃতকর্মের ব্যাপারে অনুশোচনা করত নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়া উচিৎ।

হযরত হাসান রাযি. বলেন, এ আয়াত নাযিল হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (অর্থ) ঐ সত্তার কসম যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ– কারও শরীরে সামান্য আঁচড় লাগে, অথবা শিরা-উপশিরা ধড়ফড় করে, অথবা পা পিছলে পড়ে যায়– এগুলো তার গোনাহের কারণে হয়ে থাকে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

হযরত আলী রাযি. থেকেও উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। বুযুর্গানে দীন বলেন, যেমনিভাবে শারীরিক বিভিন্ন অসুখ ও কষ্ট গোনাহের কারণে হয়ে থাকে, তেমনিভাবে 'আত্মিক রোগ'ও গোনাহের কারণে হয়ে থাকে। কেননা একটি গোনাহ অপর একটি গোনাহের কারণ হয়ে থাকে, ঠিক যেমন একটি নেকী আরেকটি নেকীর কারণ হয়ে থাকে। (মা'আরিফুল কুরআন ৭/৭০১)

অপর এক আয়াতে মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
অর্থ: মানুষ নিজ হাতে যা কামায়, তার ফলে স্থলে ও জলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কতক কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন বলে, হয়তো এর ফলে তারা ফিরে আসবে। (সূরা রূম-৪১)

এই আয়াতে ফাসাদ বা অশান্তি বলতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, জাহাযডুবি, বরকতশূন্যতা, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুর আগ্রাসন, জালিমের আধিপত্য ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। (তাফসীরে মাযহারী ৭/২৮৪, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন)

বোঝা গেলো, এই যে আমাদের উপর একের পর এক বালা-মুসীবত ধেয়ে আসছে তার মূল কারণ আমাদের গোনাহ ও পাপাচার। তবে আল্লাহ তা'আলা পরম করুণাময় বলে আমাদেরকে প্রত্যেক গোনাহের শাস্তি দেন না, বরং বহু গোনাহ মাফ করে দেন। যদি প্রত্যেক গোনাহের কারণে তিনি পাকড়াও করতেন তাহলে একজন মানুষও বাঁচতে পারতো না। বাস্তবতা এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক গোনাহ মাফ করে দেন। আর যে গোনাহগুলো মাফ করেন না সেগুলোর শাস্তিও দুনিয়াতে পুরোপুরি দেন না; আংশিক বা যৎসামান্য অংশেরই শাস্তি দিয়ে থাকেন। উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় 'কতক কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন' বলে এটাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

মানুষ যখন কোন গোনাহে ব্যাপকভাবে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীতে জড়িয়ে পড়ে তখন তার প্রতিক্রিয়ায় কখনও বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফলে অন্যান্য বোবাপ্রাণীদেরও কষ্ট হয়। এ সময় বোবাপ্রাণীরা মানুষের জন্য আল্লাহর দরবারে বদ-দু'আ করতে থাকে। উপরন্তু কিয়ামতের দিন তারা মানুষের বিপক্ষে মোকদ্দমাও দায়ের করবে।

উল্লিখিত আয়াতদ্বয় ও তার তাফসীর এবং নিম্নলিখিত হাদীসসমূহের মধ্যে কারও মনে বৈপরীত্যের সন্দেহ দেখা দিতে পারে–

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
অর্থ: দুনিয়া মুমিনের জেলখানা, কাফেরের উদ্যান। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৯৫৬)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে
عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
অর্থ: পৃথিবীতে সর্বাধিক বালা-মুসীবত আসে আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর। অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী তাদের উপর। অতঃপর যারা এদের নিকটবর্তী তাদের উপর। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৩৯৮, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৪০২৩)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–
المؤمن يموت بعرق الجبين.
অর্থ: মুমিন তার কপালের ঘামের মধ্য দিয়ে ইন্তেকাল করে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৯৮২, সুনানে নাসায়ী; হাদীস ১৮২৯)

বৈপরীত্যের সন্দেহ দেখা দেওয়ার কারণ হলো, সাধারণভাবে আমরা যেটা প্রত্যক্ষ করি সেটা হলো, পৃথিবীতে মুমিন-মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে থাকে আর কাফেররা আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। এখন আয়াতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদি দুনিয়ার যাবতীয় বিপদ-আপদ গোনাহের শাস্তি স্বরূপই হয়ে থাকে তাহলে তো ব্যাপারটি উল্টো হওয়ার কথা ছিল। অর্থাৎ কাফেরদেরকে ভয়ানক সব শাস্তি ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করার দরকার ছিল আর মুমিনদেরকে আরাম-আয়েশে রাখার কথা ছিল।

এর উত্তর হলো, আয়াতে কারীমায় গোনাহকে বিপদাপদের কারণ বলা

হয়েছে ঠিক কিন্তু বিপদাপদের একমাত্র কারণ বলা হয়নি। অর্থাৎ কারও উপর যদি বিপদাপদ আসে তাহলে সেটা তার গোনাহের কারণেই আসে এমনটি জরুরী নয়; বরং এর পেছনে অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। উদাহরণত তাকে পরীক্ষা করা, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা বা দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে আখেরাতের শাস্তি মওকুফ করা ইত্যাদি। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসসমূহের সঙ্গে আয়াতদ্বয়ের বৈপরীত্য নেই।

কুরআনের কারীমের বহু আয়াতও এই বক্তব্য সমর্থন করে। উদাহরণত আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

অর্থাৎ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনও) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনও) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনও) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। (সূরা বাকারা-১৫৫)

বোঝা গেলো, বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত ধৈর্যের পরীক্ষার জন্যও হতে পারে যে, এসব মুসীবত সত্ত্বেও কে আল্লাহর উপর আস্থা রাখে, আর কে আল্লাহকে অভিযুক্ত করে।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

অর্থ: (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কি মনে করেছ, তোমরা জান্নাতে (এমনিতেই) প্রবেশ করবে, অথচ এখনও পর্যন্ত তোমাদের উপর সেই রকম অবস্থা আসেনি, যেমনটা এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট এবং তাদেরকে করা হয়েছিল প্রকম্পিত, এমনকি রাসূল এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? মনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। (সূরা বাকারা-২১৪)

লক্ষ্য করুন, নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম এবং তাঁদের সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ তা'আলার অতি প্রিয় বান্দা ছিলেন। তা-সত্ত্বেও তাঁদের জীবনেও এমন সব ভয়াবহ ও মারাত্মক বিপদাপদ এবং চরম দুঃখ-কষ্ট এসেছে যে, তাঁরা আল্লাহর সাহায্য অবিলম্বে আসার আকাঙ্ক্ষায় বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'মাতা-নাছরুল্লাহ!' আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?

তাছাড়া জানা কথা যে, নবী-রাসূলগণ মাছুম বা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তথাপি তাঁদের উপর বিপদাপদ এসেছে। বোঝা গেলো, বালা-মুসীবত স্রেফ গোনাহের সঙ্গে শর্তযুক্ত নয়; বরং অন্য কোন বিশেষ হিকমত ও উপযোগিতার কারণেও বালা-মুসীবত আসতে পারে।

ফিরে আসি আগের কথায়। বালা-মুসীবত যদিও সব সময় গোনাহের কারণে আসে না কিন্তু কুরআন-হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী অধিকাংশ সময় গোনাহের কারণেই এসে থাকে। নিম্নলিখিত হাদীসটি লক্ষ্য করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ريحا حمراء وزلزلة وخسفا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع.

অর্থ: যখন (এক) গনীমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে, (দুই) আমানতের মালকে গনীমতের মালের মতো যথেচ্ছা ব্যবহার করা হবে, (তিন) যাকাত প্রদানকে জরিমানা মনে করা হবে, (চার) দুনিয়া হাসিলের জন্য দীন শিক্ষা করা হবে, (পাঁচ) পুরুষেরা স্ত্রীদের তাবেদারী করে মায়ের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে, (ছয়) বন্ধুদেরকে কাছে টেনে পিতাকে দূরে ঠেলে দিবে, (সাত) মসজিদগুলোতে শোরগোল হতে থাকবে, (আট) পাপাচারী লোক গোত্রের সর্দার হবে, (নয়) নীচ প্রকৃতির লোক জাতির হর্তকর্তা হবে, (১০) জুলুম ও অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য লৌকিকতা বশত মানুষকে সম্মান করা হবে, (১১) নর্তকীর সংখ্যা বেড়ে যাবে, (১২) বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, (১৩) মদ (ও নেশাদ্রব্য ব্যাপকভাবে) পান করা হবে, (১৪) পরবর্তী প্রজন্ম পূর্বসুরীদের অভিশাপ দিবে– তখন তোমরা অপেক্ষা করো অগ্নিঝড়, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, আকৃতি-বিকৃতি, উল্কাবৃষ্টি এবং এমন ক্রমাগত বিপর্যয়ের যেমন কোন পুরনো মালা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক দ্রুত বেরিয়ে আসে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২২১১)

অপর এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق موطأ مالك لمالك بن أنس، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو.

অর্থ: (এক) যখন কোন জাতি আমানতে খেয়ানত করেছে, আল্লাহ তাদের অন্তরে শত্রুভীতি ঢেলে দিয়েছেন, (দুই) যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার (অশ্লীলতা) বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের মধ্যে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পেয়েছে, (তিন) যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কম দিয়েছে, তারা প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে, (চার) যখন কোন জাতি না-হক বিচার করেছে, তখন তাদের মধ্যে রক্তপাত, হানাহানি ছড়িয়ে পড়েছে, (পাঁচ) যখন কোন জাতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর শত্রুকে চড়াও করে দিয়েছেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক; হাদীস ১৩২৩)

দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য যে, প্রথম হাদীসে বর্ণিত ১৪ টি আর দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণিত ৫টি গোনাহ ও অপকর্মের সব ক'টিই বর্তমানে ব্যাপকভাবে সংঘটিত হচ্ছে। শুধু এগুলোই নয়, এগুলো ছাড়া আরও বিভিন্ন গোনাহ দ্বারা আমাদের দেশ ও সমাজ কলুষিত। ফলে আমাদের ওপর নেমে আসছে একের পর এক বালা-মুসীবত, আযাব-গযব।

এই তো সেদিন ২২ জুলাই ২০২২ সালে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আফগানিস্তানে প্রাণ হারিয়েছে দেড় সহস্রাধিক মানুষ। সীতাকুণ্ডের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়েছে অর্ধশতাধিক বনী আদম, আহত হয়েছে পাঁচশতাধিক। চলমান বন্যায় শুধু সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনায় মারা গেছে ৮৮ জন আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৫০ লক্ষাধিক মানুষ। প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় গড়ে বাংলাদেশেই মারা যাচ্ছে তিনশতাধিক। অনুরূপভাবে নিকট ও দূর-অতীতের বিভিন্ন সাইক্লোন, টর্নেডো, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস ও সুনামীতে মুহূর্তেই প্রাণ হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। ক্যান্সারসহ নানা রকম দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে প্রতিদিন কতো লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে তার হিসেব নেই। এক করোনার ছোবলেই পুরো পৃথিবীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এপর্যন্ত ৬৩ লক্ষাধিক মানুষ।

এমনই এক চরম দুর্যোগ ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে আমাদের ভাবা উচিৎ,

(৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি : দায় ও কর্তব্য

মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ সাইম

পুরো পৃথিবী এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। অভাব-অনটনের যাঁতাকলে পিষ্ট মানবজাতি। চারদিকে শুধু 'নেই নেই' হাহাকার। ঢলের পানির মতো হু-হু করে বাড়ছে নিত্যপণ্যের দাম। অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রামান কমিয়ে দিচ্ছে দিনকে দিন। কমা-কমতির আশাও নেই, লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। মধ্যবিত্তের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। নিম্নবিত্তের লজ্জা নিবারণও কষ্টসাধ্য। স্বল্প ও সীমিত আয়ের মানুষ পড়েছে চরম বিপাকে; সমাজ-সংসার ছাড়তেও পারছে না, ধরেও রাখা যাচ্ছে না।

এই যে আর্থিক সংকট ও অসহনীয় উচ্চমূল্য এটা হুট করেই ঘটে যায় না। এর থাকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বহু উপলক্ষ, থাকে নানাবিধ কার্যকারণ। আবার এই সমস্যা ও সংকট নতুন কিছু নয়; নানা সময়ে মানবজাতি এর সম্মুখীন হয়েছে বহুবার। সেই সব সংকটের রোমহর্ষক বিবরণ লিখিত আছে ইতিহাসের বিবর্ণ পাতায়।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির টুকরো ইতিহাস

ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন– ৩৩৪ হিজরী শুরু হল। এ বছর বাগদাদে জিনিসপত্রের দাম প্রচণ্ড রকম বেড়ে গেল। লোকজন মৃত প্রাণী ও কুকুর ভক্ষণ করতে লাগল। কিছু লোক শিশুদেরকে চুরি করে আগুনে ঝলসে খেতো। প্রচুর হারে মানুষ মারা যেতো। কেউ কাউকে দাফন করতো না। লাশগুলোকে রাস্তার ধারে ফেলে রাখা হতো। অধিকাংশ লাশ কুকুর-শকুনের খোরাক হতো। খাদ্য সংগ্রহের জন্য মানুষ ঘর-বাড়ি, জমি-জিরেত বিক্রি করতে লাগল। লোকজন দলে দলে বসরা অভিমুখে ছুটে যাচ্ছিল। বেশিরভাগ পথিমধ্যেই মারা যেতো, আর বাকিরা বসরা পৌঁছে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতো।

আল্লামা ইবনুল জাওযী লিখেছেন ৪৪৮ হিজরীর ইতিহাস– দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেল। রাস্তাঘাট অনিরাপদ হয়ে উঠল। ছিনতাই-ডাকাতি শুরু হল। দরিদ্র লোকেরা অবর্ণনীয় কষ্টের শিকার হল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল মৃত্যু ও মহামারী। বিনা কাফনে, বিনা গোসলে লাশ দাফন হতে লাগল। মানুষ মৃতজন্তু ভক্ষণ করতো। পরিবেশ ঢাকা পড়ল ধূলোয়। বাতাস হয়ে গেল দূষিত। উচ্চমূল্য ও মহামারী পুরো মিসরকে গ্রাস করে নিল। দৈনিক হাজারের উপর মানুষ মারা যেতো। রজব ও শাবান মাসে এর প্রকোপ আরও বেড়ে গেল। সুলতান নিজ খরচে আঠারো হাজার লাশ দাফন করলেন। এক-এক কবরে চার-পাঁচটি করে লাশ দাফন করা হলো। মহামারী আর উচ্চমূল্য ছড়িয়ে পড়ল মক্কা, হিজায, দিয়ারে বকর, মোসেল, খোরাসানসহ পুরো দুনিয়ায়।

ইবনে কাসীর লিখেছেন ৪৬২ হিজরীর বিবরণ– মিসরে দ্রব্যমূল্য সীমা ছাড়িয়ে গেল। চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মানুষ মৃতজন্তু, লাশ ও কুকুর খেতে শুরু করল। একেকটা কুকুর পাঁচ-পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি হতো। একটা হাতি মারা গেলে লোকেরা সেটিও খেয়ে ফেলল। মিসর গবাদি পশুশূন্য হয়ে গেল। মিশরের গভর্নরের নিকট মাত্র তিনটি ঘোড়া অবশিষ্ট ছিল। কেউ আত্মীয়-স্বজনের লাশ দিনের বেলা দাফন করার সাহস করতো না; রাতের বেলা চুপিসারে দাফন করে দিতো। ভয় ছিল, না-জানি মড়া-খেকোরা কবর খুঁড়ে লাশটি খেয়ে ফেলে।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর কলমে উঠে এসেছে ৫৯৬ হিজরীর রোমহর্ষক বিবরণ– মিসরে নীল নদের প্রবাহ থমকে গেল। মাত্র তেরো হাত প্রস্থে সেটি প্রবাহিত হচ্ছিল। দ্রব্যমূল্য এতোটাই মাত্রা ছাড়াল যে, লোকেরা মৃতজন্তু ও মানুষের লাশ ভক্ষণ করতে লাগল। চরম খাদ্যসংকট দেখা দিল। এ ব্যাপারে অবিশ্বাস্য বহু বিবরণ প্রসিদ্ধ আছে। মানুষ কবর খুঁড়ে লাশ ভক্ষণ করতো। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মিসরবাসীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। চারদিকে শুধু মৃত্যুর মিছিল। পথিকের প্রতিটি পদক্ষেপ লাশ মাড়িয়ে যেতো এবং প্রতিটি দৃষ্টি লাশের ওপর নিক্ষিপ্ত হতো। গ্রামীণ লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো সবচে বেশি। গ্রামগুলোতে চুলোর ধোঁয়া নজরে পড়তো না। দেখা যেতো বাড়ির দরজাগুলো খোলা আর ভেতরে বাসিন্দাদের নিষ্প্রাণ দেহ।

ইমাম যাহাবী রহ. এই দুর্ভিক্ষের যে বর্ণনা দিয়েছেন ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে– পথগুলো যেন লাশের ক্ষেত। লাশগুলো শকুন আর হিংস্রপ্রাণী দলবেধে খুবলে খাচ্ছে। স্বাধীন লোকজন এবং শিশুদেরকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। টানা তিন বছর এই পরিস্থিতি চলমান ছিল।

৬৯৫ হিজরীর বিবরণে আল্লামা সুয়ূতী লিখেছেন– নতুন বছরের চাঁদ উঠল। মিসরবাসী তখন চরম খাদ্যসংকট ও মহামারীর সম্মুখীন। লোকেরা মৃতজন্তু ভক্ষণ করতো। এক ইরদিব গম ১৭০ দিরহামে বিক্রি হতো। মিসরী মাপের সোয়া রতলের একটি রুটি এক দিরহামে বিক্রি হতো। হতদরিদ্র লোকেরা কুকুর খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতো। লাশগুলো রাস্তাঘাটে ফেলে রাখা হতো। বড় বড় গর্ত খুঁড়ে এক-একটিতে বহু লোককে ছুঁড়ে ফেলা হতো।

১৩৫০ বঙ্গাব্দে (খ্রি. ১৯৪৩) বাংলা অঞ্চলে যে তীব্র খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তা '৫০-এর মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। এই দুর্ভিক্ষে ২১ থেকে ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। চালের অভাব দেখা দেওয়ায় ভাতের জন্য সারা বাংলায় হাহাকার পড়ে যায়। গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে দুর্ভিক্ষ। পথে-প্রান্তরে লুটিয়ে পড়তে থাকে না-খাওয়া মানুষ। এখানে ওখানে পড়ে থাকতে দেখা যায় হাড্ডিসার লাশ। হাজার হাজার বুভুক্ষু মানুষ একমুঠো খাবারের আশায় স্রোতের মতো ছুটে যাচ্ছে কলকাতায়। এসব অভাগা দলে দলে পথের ওপর পড়ে ধুঁকছে, আর ভাগাড়ের মৃতজন্তু ও উচ্ছিষ্টে ভাগ বসাতে কুকুরের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। সে সময়ের সংবাদপত্র এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের আঁকা ছবিতে ফুটে উঠেছে এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা।

অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক জন পিলজার লিখেছেন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের '৭৪-এর মন্বন্তরের দুঃখগাথা– 'একটি তিন বছরের শিশু এতই শুকনো যে, মনে হল সে যেন মায়ের পেটে থাকাকালীন অবস্থায় ফিরে গেছে। আমি তার হাতটা ধরলাম। মনে হলো, তার চামড়া আমার আঙ্গুলে মোমের মতো লেগে গেছে। এই দুর্ভিক্ষের আর একটি ভয়াবহ পরিসংখ্যান এই যে, বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার মতে ৫০ লাখ মহিলা

আজ নগ্নদেহ। পরিধেয় বস্ত্র বিক্রি করে তারা চাল কিনে খেয়েছে।’ তিনি আরও লিখেছেন–

‘সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে এবং গাড়ি আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম-এর লরীর পেছনে পেছনে চলেছে। এই সমিতি ঢাকার রাস্তা থেকে দুর্ভিক্ষের শিকারটিকে কুড়িয়ে তুলে নেয়। সমিতির ডাইরেক্টর ডাঃ আব্দুল ওয়াহিদ জানালেন, স্বাভাবিক সময়ে আমরা হয়তো কয়েকজন ভিখারীর মৃতদেহ কুড়িয়ে থাকি। কিন্তু এখন মাসে অন্তত ৬০০ লাশ কুড়াচ্ছি– সব ক’টি অনাহার-জনিত মৃত্যু।’

এই দুর্ভিক্ষ শুরু হয় রংপুর থেকে। ৪০ টাকা মন দরের চাল হুট করেই ৪০০ টাকা হয়ে যায়। চালের পয়সা জোগাড় করতে গিয়ে অনেক পিতা-মাতা কোলের সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছে। অনেকে সন্তানের মুখে ভাত তুলে দিতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। এই দুর্ভিক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মারা যায় দশ লক্ষ মানুষ।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির আভ্যন্তরীণ কারণ

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির অন্তর্নিহিত কারণ যমীনবাসীর নাফমরমানী ও পাপাচারের আধিক্য। ইরশাদ হচ্ছে–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

অর্থ: মানুষ নিজ হাতে যা কামায়, তার ফলে স্থলে ও জলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কতক কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন বলে, হয়তো এর ফলে তারা ফিরে আসবে। (সূরা রূম-৪১)

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন,

أي ظهر قلة الغيث وغلاء السعر بما كسبت أيدي الناس.

অর্থ: মানুষের কৃতকর্মের কারণে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়। (তাফসীরে তাবারী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন,

أقبل علينا رسول الله، يا معشر مهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولو لا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم.

অর্থ: একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করে বললেন, হে মুহাজির সম্প্রদায়! তোমরা যখন পাঁচটি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে– আল্লাহর পানাহ চাই এগুলো তোমাদেরকে ঘায়েল না করুক– (এক) কোন সম্প্রদায় যখন ব্যাপকভাবে ব্যভিচারে মত্ত হয়, তাদের মধ্যে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং এমন সব রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে যেগুলো তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে ছিল না। (দুই) যখন ওজন ও পরিমাপে কম দেয়, দুর্ভিক্ষ, দুঃসহ ব্যয়ভার এবং বাদশাহর জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়। (তিন) যখন সম্পদের যাকাত আদায় করে না, আকাশ থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হয়; অবোধ প্রাণীকুল না থাকলে এ সময় বৃষ্টিই হতো না। (চার) যখন আল্লাহ এবং তার রাসূলের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তাদের উপর বিজাতীয় শত্রুদেরকে চাপিয়ে দেয়া হয়, যারা তাদের সবকিছু লুটে নেয়। (পাঁচ) যখন শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে না এবং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ তাদেরকে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করে দেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৪০১৯)

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির আভ্যন্তরীণ কারণ সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন–

فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده ولا يكون شيئ منها إلا بمشيئته وقدرته لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببا في بعض الحوادث كما جعل قتل القاتل سببا في موت المقتول وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد وانخفاضها قد يكون بسبب احسان بعض الناس.

অর্থ: পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্ফীতি ও মূল্যহ্রাস উভয়ের নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ তা’আলা। আল্লাহর ইচ্ছা ও এরাদা ব্যতীত এর কোনটিই ঘটে না। তবে আল্লাহ তা’আলা কতিপয় বান্দার কর্মপন্থাকে কোন কোন ঘটনার উপলক্ষ বানিয়ে দেন। যেমন খুনীর হত্যাকাণ্ডকে নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর উপলক্ষ বানিয়ে দেন। সে হিসেবে আল্লাহ তা’আলা কখনও কখনও কতিপয় বান্দার জুলুম-অত্যাচারকে মূল্যস্ফীতির উপলক্ষ বানিয়ে দেন আবার কতিপয় বান্দার অনুগ্রহমূলক কর্মকাণ্ডকে মূল্যহ্রাসের উপলক্ষ করে দেন। (মাজমূউল ফাতাওয়া ৮/৫১৯)

উল্লিখিত প্রমাণাদির আলোকে স্পষ্ট হলো, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির আভ্যন্তরীণ কারণ গোনাহের ব্যাপকতা ও সীমাহীন পাপাচার।

বর্তমানকালে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাহ্যিক কারণ

এক. সীমাহীন লোভ-লালসা এবং যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জনের ঘৃণ্য প্রতিযোগিতা।

সম্পদের প্রতি আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বভাবজাত একটি বিষয়। কিছুটা আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা না থাকলে মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। নিজের প্রয়োজন মিটে গেলে তার আর কাজ করার আগ্রহ থাকে না। তবে সম্পদ উপার্জনের এই আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা হালাল ও বৈধ পন্থায় সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। পক্ষান্তরে যে লোভ-লালসা হালাল-হারামের পার্থক্য ঘুচিয়ে দেয় এবং যে কোন পন্থায় সম্পদ অর্জনের পথে ধাবিত করে সেটা নিষিদ্ধ লোভ। বর্তমানে মানুষের এই অবৈধ লোভ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। মানুষ এখন যে কোন উপায়ে সম্পদের পাহাড় গড়তে চায়। এতে কেউ মরল কি বাঁচল এ নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কাজেই ১০ টাকায় কেনা পণ্যটি ক্রেতার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ২৫ টাকায় বেচতে তার একটুও বিবেকে বাধে না।

দুই. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাহীনতা।

বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণের পর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে সকল দু’আ করেছিলেন তার অন্যতম হল–

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! এটাকে এক নিরাপদ নগর বানিয়ে দাও এবং এর বাসিন্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনবে তাদেরকে বিভিন্ন রকম ফলের রিযিক দান করো। (সূরা বাকারা-১২৬)

উল্লিখিত দু’আয় যুগপৎ নিরাপত্তা ও রিযিক কামনা করা হয়েছে। এর দ্বারা অনুমিত হয় যে, নিরাপত্তা ও রিযিকের মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ যোগসূত্র রয়েছে। তাছাড়া যে কোন কারণেই হোক, কোন দেশে সার্বিক নিরাপত্তায় ঘাটতি থাকলে তা আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমদানীকারকেরা লোকসানের আশংকায় আমদানী কমিয়ে দেয়। রপ্তানীকারকেরা পাওনা উদ্ধারের শংকায় থাকে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে হিম্মত পায় না। এভাবে একপর্যায়ে পণ্য ও অর্থসংকট শুরু হয়।

তিন. ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট বাণিজ্য ও মজুদদারী।

ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট বাণিজ্য ও মজুদদারী কিভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। পর্যাপ্ত মজুদ থাকা সত্ত্বেও পেঁয়াজ আর সয়াবিন তেলের উচ্চমূল্য এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

চার. সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ে লাগামহীন দুর্নীতি।

যে দেশের সাধারণ জনগণ বন্যাদুর্গত মানুষের উদ্ধারকর্মে একবেলার ট্রলার ভাড়া নেয় ৫০ হাজার টাকা, যে দেশের সরকারী অফিসের টেবিল-চেয়ারটাও ঘুষের জন্য হা করে থাকে সে দেশে দুর্নীতির মাত্রা অনুমান করা অসম্ভব নয়। বালিশকাণ্ড, পর্দাকাণ্ড এগুলো তো নিছক নমুনা এবং ভাসমান বরফখণ্ডের দৃশ্যমান চূড়া। আল্লাহ হেফাজত করুন।

পাঁচ. মানি লন্ডারিং বা বিদেশে অর্থপাচার।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে দেশ থেকে পাচার হয়েছে কমপক্ষে **১১** (এগারো) লক্ষ কোটি টাকা। এই পরিমাণ টাকা বাংলাদেশের দুই বছরের বাজেটের সমান। বলুন, ত্রিশ হাজার কোটি টাকায় পদ্মাসেতু নির্মাণ করা গেলে এগারো লক্ষ কোটি টাকায় কয়টি পদ্মাসেতু নির্মাণ করা সম্ভব!? এই টাকাগুলো ডলারে পরিবর্তিত হয়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। সে হিসেবে সমপরিমাণ ডলারও দেশ থেকে বেরিয়ে গেছে। ফলে আমদানীকারকেরা ডলার সংকটের কারণে অধিক টাকায় ডলার কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে ডলারের দাম বেড়ে গিয়ে টাকার মান নিচে নামছে। আগে যে পণ্যটি **১০** ডলার দিয়ে আমদানী করা হতো, ধরে নেয়া হলো এখনও সেটি **১০** ডলার দিয়েই আমদানী করা হচ্ছে। কিন্তু সমস্যাটা হলো, আগে **১০** ডলারের ক্রয়মূল্য ছিল ৮২ টাকা হারে ৮২০ টাকা এখন সেই **১০** ডলার কিনতে হচ্ছে **১০২** টাকা হারে **১০২০** টাকায়। এভাবে মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির অনুপাত ৫.৬ শতাংশ। স্বভাবতই এর ঘানি টানতে হচ্ছে ভোক্তা সাধারণকে।

ছয়. চাঁদাবাজ ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম।

যশোরের একজন কৃষকের কাছ থেকে ৫ টাকা দরে কেনা **১** কেজি বেগুন পরিবহনব্যয় ও আনুষঙ্গিক খরচাদিসহ ঢাকার পাইকারী বাজারে সর্বোচ্চ ৮/৯ টাকা আর ভোক্তা পর্যায়ে সর্বোচ্চ **১**৪/**১**৫ টাকা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঢাকায় পৌঁছা পর্যন্ত ঘাটেঘাটে চাঁদাবাজি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্নে সেই বেগুন ভোক্তাদেরকে কিনতে হচ্ছে ৪০/৫০ টাকায়।

সাত. দীর্ঘ মেয়াদী লাভে মেগা প্রকল্প গ্রহণ।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন দেশ ও দেশবাসীর পরম কাম্য একটি বিষয়। এ ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োজন ও রাষ্ট্রের সামর্থ্য অনুপাতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। যার প্রতি বেলা ভাত খাওয়ার জন্য ৬০ টাকা ব্যয় করা সামর্থ্য আছে, সে যদি ফাইভস্টার হোটেল থেকে ৩,০০০ টাকায় দুই বেলার খাবার ক্রয় করে তাহলে পরবর্তী ৪৮ বেলা হয়তো তাকে না-খেয়ে থাকতে হবে, নয়তো এর জন্য ২৮৮০ টাকা ঋণ করতে হবে। সুতরাং যেসব উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেট ধরা হয় হাজার হাজার কোটি টাকা, সেগুলো যদি ঋণ করে বাস্তবায়ন করতে হয় এবং ঋণ পরিশোধ করে লাভের মুখ দেখতে দেখতে ৪০/৫০ বছর লেগে যায়, আমাদের মতে ঋণ করে এমন বিরিয়ানী না-খাওয়াই ভালো!

আট. খেলাপী ঋণের আধিক্য।

ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের নিকট থেকে যেসব অর্থ সংগ্রহ করে থাকে, সেগুলো আবার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ঋণগ্রহিতার ঋণসমপরিমাণ স্থাবর সম্পদ ব্যাংকের নিকট জামানত বা বন্ধক রাখতে হয়। কিছু দুর্নীতিবাজ ঋণগ্রহিতা স্থাবর সম্পদের ভুয়া কাগজ-পত্র দাখিল করে ঋণ গ্রহণ করে। আবার কিছু অসাধু ব্যাংক মালিক ও কর্মকর্তা সবকিছু জেনেও পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে বিধিবহির্ভূত ঋণ প্রদাণ করে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঋণগুলোর বড় অংশ কিংবা পুরোটাই পরিশোধ করা হয় না। এভাবে খেলাপী ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। ফলে মাঝে-মধ্যে ব্যাংকও দেউলিয়া হয়ে পড়ে। আইন অনুযায়ী গ্রাহকগণ তখন নামমাত্র কিছু টাকা ফেরৎ পায়। এভাবে খেলাপী ঋণ যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন প্রান্তিক গ্রাহকেরা তাদের সারা জীবনের পুঁজি হারিয়ে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে। ২০২২ সালের ৩রা মার্চ পর্যন্ত দেশী খেলাপী ঋণের পরিমাণ ছিল **১** (এক) লক্ষ কোটি টাকারও বেশী। এদিকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের আকার ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ খেলাপী ঋণ বাজেটের সপ্তমাংশ প্রায়।

নয়. শিল্পপ্রধান অর্থনীতি গ্রহণ।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য শিল্পপ্রধান অর্থনীতি পরিণামে খুব একটা সুফল বয়ে আনে না। শক্তিশালী অর্থনীতির জন্য অবশ্যই শিল্পের প্রয়োজন রয়েছে, তবে সেটাই প্রধান নিয়ামক নয়। শক্তিশালী অর্থনীতির প্রধান নিয়ামক শক্তিশালী কৃষিব্যবস্থা। খাদ্যচাহিদা মেটাতে আমদানী নির্ভর না হয়ে কৃষিবিপ্লবের মাধ্যমে রপ্তানীমুখী হতে পারাটা টেকসই অর্থনীতি গড়ার প্রধান চ্যালেঞ্জ। কৃষিতে আমদানীনির্ভর হলে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খাদ্যসংকট অনিবার্য।

এছাড়াও চলমান অর্থসংকট ও উচ্চমূল্যের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাহ্যিক বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সদিচ্ছা থাকলে সেগুলো খুঁজে বের করে সমাধান করা অসম্ভব নয়।

এ পর্যায়ে অর্থসংকট ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি চলাকালীন কার কি করণীয় তা সংক্ষেপে বিবৃত হচ্ছে–

রাষ্ট্রের করণীয়:

(১) সকল প্রকার জুলুম-অত্যাচার বন্ধ করা এবং সর্বস্তরে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

(২) আযাব-গজব ডেকে আনে এমন সকল কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করা।

(৩) সুদমুক্ত অর্থ-ব্যবস্থা চালু করা।

(৪) রাষ্ট্রীয় সকল কাজে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা।

(৫) দুর্নীতিবাজদের তালিকা তৈরি করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা।

(৬) মজুদদার ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া।

(৭) মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা।

(৮) ব্যবসায়ীদের স্বার্থের তুলনায় ভোক্তা-সাধারণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া।

(৯) শিল্পের তুলনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষকদেরকে উৎসাহ, সহযোগিতা ও প্রণোদনার মাধ্যমে দেশকে প্রকৃত অর্থে কৃষিনির্ভর করে গড়ে তোলা।

(১০) কৃষিবিনাশী সকল শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দেয়া।

(১১) উৎসাহ প্রদান ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে চাষাবাদযোগ্য কোন জমি অনাবাদি না থাকে তা নিশ্চিত করা।

(১২) আমদানীর ক্ষেত্রে বিলাসীপণ্যের তুলনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যকে অগ্রাধিকার দেয়া।

(১৩) রপ্তানীর ক্ষেত্রে দেশের চাহিদা মিটিয়ে অতঃপর রপ্তানী করা।

(২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

তাবলীগ জামাতের সিংহপুরুষ

হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান রহ.-এর সোহবত হতে প্রাপ্ত অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার

বয়ান লেখক: প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম (আহলে কাকরাইল)

পটভূমি: *আমার পরম সৌভাগ্য যে, ১৯৭৩-১৯৮৭ ঈসায়ী পর্যন্ত প্রায় পনেরোটি বছর তাবলীগ জামাত-এর কিংবদন্তি, কাকরাইলের বিশিষ্ট মুরুব্বী হযরত মাওলানা লুৎফর রহমান ছাহেব রহ.-এর সোহবত লাভে ধন্য হয়েছি। এই দীর্ঘ সময়ে হযরতের মুখনিঃসৃত বিভিন্ন বয়ান ও নসীহত যেমন ডায়েরীর পাতায় লিপিবদ্ধ করেছি, তেমনই তাঁর বিভিন্ন আচরণ ও উচ্চারণ স্মৃতির পাতায় সংরক্ষণ করেছি। বস্তুত তিনি ছিলেন দাওয়াত ও তাবলীগের প্রথম সারির মুরুব্বিয়ানে কেরামের তরজুমান-ভাষ্যকার। ছিলেন দাওয়াত ইলাল্লাহর তরে নিবেদিতপ্রাণ 'রিজাল'-সিংহপুরুষ। তাঁর আচরণ ও উচ্চারণ ছিল উম্মতের জন্য অমূল্য রত্নভাণ্ডার। যারা টঙ্গীর ময়দানে কিংবা কাকরাইলের মিম্বরে তাঁর অন্তরাত্মায় করাঘাতকারী বয়ান শুনেছেন তারা অপকটে এর স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য। সেই মহামূল্য রত্নভাণ্ডারের সামান্য ঝলক পাঠকের খিদমতে পর্যায়ক্রমে 'ডায়েরীর পাতা' ও 'স্মৃতির পাতা' শিরোনামে পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আ-মীন।*

ডায়েরীর পাতা

১৯৭৩ সালের বয়ান হতে

স্থান : মসজিদুল আকবার, মিরপুর-১ (আমার মহল্লার মসজিদ)।

হযরত আফ্রিকা সফর করে সবেমাত্র ফিরেছেন। বয়ানে ঈমান জাগানিয়া কারগুজারী বলেছেন। আফ্রিকায় তখন বর্ণবিদ্বেষ তুঙ্গে। এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি চাঁদের মতো ফুটফুটে এক শিশু কোলে মসজিদে হাজির। হুযূর শিশুটির পরিচয় জানতে চাইলেন। কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি জানাল, এটি তার ঔরসজাত সন্তান। হুযূর প্রশ্ন করলেন, তার স্ত্রী 'শেতাঙ্গ' কিনা। জবাব এলো– না, বরং তারই মতো কালো। হুযূর ফের প্রশ্ন করলেন, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কালো হলে সন্তানটি এমন চাঁদপনা সাদা হলো কীভাবে? জবাব দিল, তারা স্বামী-স্ত্রী সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহর কাছে চেয়েছিল যে, তাদের সন্তান শেতাঙ্গ হলে সাদা-কালো নির্বিশেষে সবার কাছে বিনা দ্বিধায়, বিনা বাধায় দীনের দাওয়াত পৌঁছাতে পারবে। ব্যস, আল্লাহ দু'আ কবুল করেছেন! হুযূর বলেন, তাদের স্বামী-স্ত্রীর ইয়াকীনের দৃঢ়তা এবং দু'আ করলেই যে পাওয়া যায় এই সহজাত বিশ্বাস দেখে বিস্মিত ও লজ্জিত হলাম যে, হায়! আমাদের বিশ্বাস কতই না দুর্বল! আমাদের বিশ্বাস এতোই দুর্বল যে, আমরা দু'আটাও অন্যের কাছে চেয়ে বেড়াই। আসলে আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তটাই দুর্বল। আমরা আল্লাহর কথা শুনি না, এজন্য সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইতেও সাহস পাই না; দু'আর জন্য বুযুর্গদের পিছনে ঘুরি।

তাশকীল: আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ঈমানের মেহনত করে ঈমান মজবুত করতে হবে, আমল সুন্দর করতে হবে। তখন দু'আ অবশ্যই কবুল হবে। দু'আ কবুল হওয়াটাই স্বাভাবিক আর দু'আ কবুল না হওয়াটা অস্বাভাবিক।

১৯৭৯ সালের মে মাসের বয়ান হতে

স্থান : কবি জসীম উদ্দীন হল (আমার আবাসিক হল), ঢাকা ইউনিভার্সিটি।
তারিখ : ০১ লা মে ১৯৭৯, মঙ্গলবার (সাপ্তাহিক গাশতের দিন)। দিবাগত বাদ মাগরিব।

হযরত বলেন, 'আল্লাহ' হলো আল্লাহ পাকের যাতী (সত্তাগত) নাম। তাঁর ৯৯টি বড় বড় গুণবাচক নাম রয়েছে। 'আল্লাহ' শব্দটি আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্য প্রযোজ্য নয়। 'আল্লাহ' শব্দের কোন প্রতিশব্দ নেই। 'আল্লাহ'কে এড়ফ বলা যাবে না। আল্লাহ ও এড়ফ এক (সমার্থক) নয়। কারণ, এড়ফ এর স্ত্রী লিঙ্গ আছে এবং বহুবচনও আছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ এগুলো হতে পুরোপুরি পবিত্র; আল্লাহ শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ হয় না, আল্লাহ শব্দের বহুবচনও হয় না।

এড়ফ এর প্রথম অক্ষর 'এ' বাদ দিলে হয়ে যায় ঙফ (অর্থহীন)। এড়ফ এর শেষ অক্ষর বাদ দিলে হয় এড় (অর্থ: যাও, ভাগো)। আল্লাহ (الله) শব্দের শব্দাংশে অর্থের কোনই পরিবর্তন হয় না। প্রথম অক্ষর বাদ দিলে হয় 'লিল্লাহ' (لله) (অর্থ: আল্লাহর জন্য, لله ما فى السموات والارض অর্থাৎ, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব আল্লাহ তা'আলারই)

প্রথম দুই অক্ষর বাদ দিলে হয় 'লাহু' (له) (له ما فى السموات و الارض অর্থাৎ, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই)

প্রথম তিন অক্ষর বাদ দিলে হয় 'হু' (অর্থ: তিনি। هو الله الذى لا اله الا هو অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।)

আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করে এমন একজন লোক দুনিয়ার বুকে থাকা অবধি কেয়ামত হবে না; আল্লাহ শব্দ এমনই শক্তিশালী। الله শব্দের মধ্যে ইসমে আযম রয়েছে, যা ব্যবহারে যে কোন অসাধ্য সাধন করা যায়। তবে শর্ত হল, আল্লাহ ছাড়া অন্তরে অন্য কিছুই থাকতে পারবে না। আল্লাহর যাতী (সত্তাগত) নাম 'আল্লাহ' আর অন্যতম সিফাতী (গুণবাচক) নাম 'রহমান'। হাদীস শরীফে এসেছে, মানুষের জন্য সবচে' ভালো নাম দু'টি– ১. আব্দুল্লাহ ২. আব্দুর রহমান।

[আল্লাহর শোকর, হযরতের এ বয়ান থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ঘটনা পরিক্রমায় ১০/১১ বছর পর আব্দুর রহমান ও আব্দুল্লাহ নামে আমার দু'টি সন্তানের নাম রাখার তাওফীক হয়েছে।]

যমীন ও আসমানের চাবি হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এর হাকীকত হাসিল করতে হবে। দৈনিক ১০০ বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির করলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল করে দিবেন।

যে ইস্তেখারা করে কাজ করে সে নিরাশ হবে না। যে পরামর্শ করে কাজ করে সে লজ্জিত হবে না। যে পরিমিত ব্যয় করে, সে দরিদ্র হবে না।

[বয়ানের এ পর্যায়ে হযরত তিনটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন]

১ম প্রশ্ন: স্বপ্ন কখনও সত্য হয়, আবার কখনও মিথ্যা হয়– এর কারণ কী?

জবাব: স্বপ্নে রূহ যদি লাওহে মাহফূয পর্যন্ত পৌঁছে থাকে তাহলে স্বপ্ন সত্য হয়। আর রূহ তত দূরে না গিয়ে ফিরে আসলে স্বপ্ন ভ্রান্ত হয়।

২য় প্রশ্ন: অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কথাও লোকে ভুলে যায় এবং পরে মনে হয়– এর কারণ কী?

জবাব: অন্তর-আকাশে বহু আকাশ স্থান পেলেও তা ক্ষুদ্র মনে হয়। তাতেও মেঘ, বাদল আসে। মেঘ আসলে লোকে ভুলে যায়, মেঘ সরে গেলে মনে পড়ে যায়।

৩য় প্রশ্ন: অনেক সময় অল্প সময়েই বন্ধুত্ব হয়ে যায় আবার বহুদিন কাছাকাছি থেকেও বন্ধুত্ব হয় না– এর কারণ কী?

জবাব: রূহানী জগতে যার সঙ্গে যার সাক্ষাৎ হয়েছে দুনিয়াতে এক সাক্ষাতেই তাদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়, অন্যথায় বহুদিন পাশাপাশি থাকলেও বন্ধুত্ব হয় না।

কেউ যদি আল্লাহ পাকের কাছে প্রিয় হতে চায় সে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে বেশি করে আঁকড়ে ধরে। আল্লাহওয়ালাদের নযরে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে। এক আল্লাহর ওলী পতিতালয়ে গেলেন। সূরা তীন তিলাওয়াত করলেন। বয়ান করলেন। এর উসিলায় আল্লাহ তা'আলা পতিতাকে হিদায়াত দান করলেন। একজন সাধারণ লোক আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করলে তার নযরেও শক্তি পয়দা হবে। তার কথার মধ্যেও নূর পয়দা হবে। এজন্যই দেখা যায়, কুরবানী দেয়া সাধারণ লোকের কথায়ও লোকেরা চিল্লার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

ইসলাম ন্যাচারাল ধর্ম। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা যত বেশি করে অনুসরণ করবে, সে তত বেশি সাফল্য লাভ করবে। দুনিয়ার লোকের মধ্যে আজ পেরেশানী। ইউরোপ, আমেরিকায় নৈতিকতার ভাঙন। সবখানে নিদারুণ অশান্তি ও পেরেশানী। সমাধান হিসেবে দ্বিতীয় হযরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. বলতেন, ইসলামের সৌন্দর্যকে দুনিয়াবাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। সভ্যতা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তরীকা। এই সুন্নাতকে পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে তুলে ধরতে হবে। তারা ইসলামকে আলিঙ্গন করবে স্বেচ্ছায়।

মুসলমানের পেশাব করে সুন্নাত তরীকায় পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি দেখে অমুসলিমরা মুসলমান হয়েছে ও হচ্ছে। সুন্নাতের এতই কীমত, এতই দাম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা আদনা-কে-আদনা সুন্নাত সাত আসমান ও যমীনের চেয়ে ভারি। এমন একদিন ছিল, মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কারও ভয় ছিল না। ইজ্জত ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত। পোশাক-পরিচ্ছদ কিংবা মাল ও মুলকের মধ্যে নয়। যখন মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করবে– ১. আল্লাহ তা'আলার গায়েবী নেযাম তাদের পক্ষে হয়ে যাবে। ২. আসমান-যমীনের বরকত যাহের হবে। ৩. মুসলমানগণ অমুসলিমদের উপর ইজ্জত লাভ করবে।

তাশকীল: একজনকে আল্লাহর রাস্তায় বের করা যত দেশে সূর্য উদিত হয় সেগুলোর মালিকানা লাভের চেয়েও উত্তম।

<u>১৯৭৯ সালের জুলাই মাসের বয়ান হতে</u>

স্থান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ।

তারিখ: ১৪ই জুলাই ১৯৭৯ শনিবার। দিবাগত বাদ মাগরিব।

তাবলীগের মেহনতে পাঁচ রকমের লাভ:

১. দীনের উপর চলার যোগ্যতা লাভ হবে।

২. মানুষের দিলকে আল্লাহ তা'আলা জুড়ে দিবেন।

৩. আল্লাহ তা'আলার গায়েবী মদদ লাভ হবে।

৪. আল্লাহ তা'আলা বরকত যাহির করবেন।

৫. কাফেরের গোলামী থেকে মুসলমানকে বের করে আনবেন। কাফেরের দিলে ভয় ঢুকিয়ে দিবেন।

<u>১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসের বয়ান হতে</u>

স্থান : কাকরাইল মসজিদ।

তারিখ: ৩০ নভেম্বর ১৯৮৬ রবিবার। দিবাগত বাদ মাগরিব

আল্লাহ খাহেশাত পুরা করার জন্য জান্নাত রেখেছেন। দুনিয়া হাজত পুরা করার জায়গা। মনে করিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ একদল পবিত্র ইনসান পাঠিয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন্নাবিয়্যিন। খাতমে নবুওয়াত অর্থ নবুয়তের উপর সিলমোহর হয়ে গেছে; এখন আর ভেতরের জিনিস বাইরে যাবে না, বাইরের জিনিস ভেতরে আসবে না।

প্রথমে আসল নবুওয়াত– اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সূরা আলাক্ব-০১)

পরে আসল রিসালাত– يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. (হে বস্ত্র আচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্ক করুন এবং আপনার রব্ব-এর বড়ত্বের দাওয়াত দিন। (সূরা মুদ্দাসসির-০১-০৩)

এভাবে দাওয়াতের আমল আসল। একটার পর একটা আমল আসতে থাকল। দাওয়াতের আমল চালু ছিল। দাওয়াতের আমল সর্বদা ছিল। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিসিম মুবারক থেকে সর্বাধিক বের হয়েছে দাওয়াতের আমল। তিনি বেহুদা কথা বলেননি কোনদিন। বানোয়াট কথা বলেননি কোনদিন। তিনি বলে দেন– সূর্য গ্রহণের সঙ্গে পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার মাহবুব; কিন্তু হিদায়াত এতো মাহবুব যে তা নবীর হাতেও দেননি। হযরত বেলাল রাযি. সাত নম্বরে ইসলাম গ্রহণ করেন। হিদায়াত আল্লাহর হাতে না থাকলে বেলাল রাযি. ৭ (সাত) নম্বরে হিদায়াত পেতেন কিনা সন্দেহ! অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাণপ্রিয় চাচা হিদায়াত ছাড়াই মারা গেল। আয়াত নাযিল হলো–

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

(অর্থ : তুমি যাকে মহব্বত করো, তাকে হিদায়াত দিতে পারবে না, আমি যাকে ইচ্ছা করি সে হিদায়াত পাবে। সূরা ক্বাসাস; আয়াত ৫৬)

আসল পিপাসা আখেরাতে। আসল ক্ষুধা আখেরাতে। আসল সাপ আখেরাতে। আসল বিচ্ছু আখেরাতে। আখেরাত আসল, দুনিয়া নমুনা। দুনিয়ার বিবি মাঝে-মধ্যে নাপাক হয়। আখেরাতের বিবি চির পাক-পবিত্র। জান্নাতের নেয়ামতের সামান্য নমুনা দুনিয়াতে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ বলছেন, আমি কসম করে নিয়েছি যে, পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে যেতে হবে। আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারা ৭০ (সত্তর) হাজার শিকল দিয়ে দোযখকে টেনে নিয়ে আসবে। একেক শিকলে ৭০ (সত্তর) হাজার ফেরেশতা থাকবে। হিদায়াতপ্রাপ্ত ৭ (সাত) রকম লোক আরশের ছায়া পাবে। সেদিন মুনাফিক মুমিনকে বলবে, একটু নূর দাও। মুমিন জবাবে বলবে, পিছন থেকে নিয়ে আসো। মুনাফিক

পিছনে ফিরতে ফিরতে মুমিন বেহেশতে পৌঁছে যাবে। মুনাফিক বলবে, পিছনে নূর কোথায়? জবাব আসবে, দুনিয়াতে যা পিছনে ফেলে এসেছো। সেখানে মেহনত করে আমি নিয়ে এসেছি।

আমলে নূর থাকে। কুরআনের একেকটি হরফে সূর্যের চেয়েও বেশি নূর। দাওয়াতের নূর সব আমলের নূরের চেয়ে বেশি। সূর্যের আলোয় ছোট ছোট আলো দেখা যায় না। যিকির, তিলাওয়াতের নূর ঢেকে যায় দাওয়াতের নূরে।

আরবে দীন এসেছে মুজাহিদীনদের মাধ্যমে। আমাদের এখানে দীন এসেছে প্রধানত বুযুর্গ-মাশায়েখদের মাধ্যমে। হিদায়াতের সমস্ত রাস্তা লুকানো রয়েছে মুজাহাদার মধ্যে।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.

(অর্থ : যারা আমার রাস্তায় মেহনত-মুজাহাদা করে, আমি অবশ্যই অবশ্যই তাদের জন্য হিদায়াতের সমস্ত রাস্তা উন্মুক্ত করে দিব, আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন। সূরা আনকাবূত–৬৯)

নফস মুজাহাদা করতে চায় না, নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করতে চায় না। হ্যাঁ, সাময়িক মাশাক্কাত বা কষ্ট করতে প্রস্তুত থাকে। সাময়িক কষ্ট-মাশাক্কাত দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফায়দা হাসিল হয় না; কাঙ্ক্ষিত ফায়দা হাসিল হয় মুজাহাদা বা সাধনা দ্বারা। হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলেন, এ রাস্তায় বের হয়ে শরাবখোরও যদি উসূলমতো মেহনত করে, হিদায়াত পাবে। চিল্লা লাগিয়েও যার পরিবর্তন হয় না, নিশ্চয় সে উসূলমতো সময় লাগায়নি। দীনের মেহনত আখেরাতের জন্য করতে হয়। ইখলাসের সাথে করতে হয়। জাহান্নামের আগুন সর্বপ্রথম তাকে দিয়ে প্রজ্বলিত করা হবে, যে দীনের কাজ ইখলাসের সাথে করেনি। কুরবানী বেশি করলে আল্লাহ হিদায়াত বেশি দিবেন। আখেরাতেও মর্যাদা বুলন্দ হবে। হযরত আবূ বকর রাযি. বেশি কুরবানী করেছেন, হিদায়াতও বেশি পেয়েছেন, জান্নাতেও মর্যাদা অধিক বুলন্দ হয়েছে।

সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পড়ে দম করলে দাজ্জাল সুযোগ পাবে না। ইয়াজুজ মাজুজ সব খাবার, পানি শেষ করে ফেলবে। মানুষ তখন যিকির দ্বারা বেঁচে থাকবে।

মানুষের আসল হাজত ও প্রয়োজন হলো হিদায়াত। এজন্য আল্লাহ তা'আলা হিদায়াতের জন্য দু'আ করা অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন। আমরা সূরা ফাতিহায় اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (অর্থাৎ- আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন) বলে দৈনিক কমপক্ষে ১৭ (সতের) বার হিদায়াতের জন্য দু'আ চাচ্ছি। অথচ জানি না কী চাচ্ছি! কেউ ক্ষেত-খামারে মেহনত না করে ফসলের জন্য দু'আ চায় না। পরীক্ষা না দিয়ে পাসের জন্য দু'আ চায় না। বিয়ে না করে সন্তানের জন্য দু'আ চায় না। কিন্তু একদল আছে যাদের দু'আ ও মেহনতে মিল নেই। দু'আ করে হিদায়াতের জন্য কিন্তু নবীর মতো মেহনত করে না।

জান্নাতে আদ্‌নে এক মাকাম আছে। সেখানে ৫০০ (পাঁচশত) দরজা আছে। প্রতিটি দরজায় ৫০০০ (পাঁচহাজার) হুর আছে। মোট ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ হুর। সেখানে এক বাড়িতে ৭০ বালাখানা। প্রতি বালাখানায় ৭০ কামরা। প্রতি কামরায় ৭০ বিছানা। প্রতি বিছানায় ৭০ বাঁদী। এ সব পেতে হলে আল্লাহর ভয়ে চোখ-কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিফাযত করতে হবে।

তা'লীমের হালকায় বসব– ইলম বাড়াবার জন্য না, আমলের প্রতি শওক্ব ও আগ্রহ পয়দা করার জন্য। আমলের পুরস্কার তো 'ঈমানান ও ইহতিসাবান'-এর উপর। ইলম বাড়াব উলামায়ে কিরামের খিদমতে হাজিরা দিয়ে।

৬ সিফাতের সাথে খানা, শোয়া, সব কাজ করব। ৬ সিফাত নিজের জীবনে আনার জন্য মেহনত করব। সকল আমল আল্লাহর কাছে কবুল করাতে ৬ সিফাত লাগবে। রোযা রাখব ৬ সিফাতের সাথে। যাকাত আদায় করব ৬ সিফাতের সাথে। হজ্জ করব ৬ সিফাতের সাথে। যবান থেকে সর্বদা ৬ সিফাতের কথাই বের হবে।

এক আল্লাহওয়ালা মহিলা দৈনন্দিনের কথাবার্তাও কুরআনের আয়াত দিয়ে বলতে পারতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কয়দিন হলো এখানে এসেছো? সে কুরআনের আয়াত দিয়ে জবাব দিলো। প্রশ্ন করা হলো খেয়েছো? সে কুরআনের আয়াত দিয়ে জবাব দিলো। এভাবে সকল প্রশ্নের জবাব সে কুরআনের আয়াত দিয়ে দিতে লাগল। মহিলার সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার মা কতদিন যাবৎ এভাবে কুরআনের আয়াত দিয়ে কথা বলেন? উত্তর আসল ৪০ বছর!!

আমরা যারা হাফেয, আলেম নই তারা ৬ নম্বর-এর যে কোন নম্বর (যখন যেটা প্রযোজ্য) দিয়ে কথা বলব। নামাযের সিফাতে ২৪ ঘণ্টা কাটাব। যে কিতাব পড়তে বলা হয়েছে সেটাই পড়ব। অন্য কিতাব খারাপ না, কিন্তু কোন হক্কানী আলেমকে জিজ্ঞেস না করে পড়ব না।

নুসরত সম্পর্কে

স্থান : কাকরাইল মসজিদ।
তারিখ : ২৮ মার্চ ১৯৮৬ জুমাবার।
(২দিনের শুরার জোড়ের প্রথম দিন)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের থেকে একটি জিনিস চান। সেটা হলো তাঁর দ্বীনের নুসরত। কেউ দ্বীনের নুসরত করলে আল্লাহ তাকে নুসরত করবেন মউতের সময়, কবরে ও হাশরে।

কবুল হওয়ার জন্য কাবেল (যোগ্য) হওয়া শর্ত নয়। মক্কার লোকদের উল্লেখযোগ্য কোন গুণই ছিল না। তারা জুয়া খেলত, মদ পান করত, ব্যাভিচার করত। কিন্তু তাদের একটা গুণ ছিল– মেহমানদারী। আল্লাহ তা'আলা এই গুণ কবুল করে মক্কাবাসীর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন।

হিদায়াতের কথা

স্থান : কাকরাইল মসজিদ।
তারিখ: ১৪ এপ্রিল ১৯৮৬ সোমবার।

তিনটি বিশেষ সুন্নাত:
১. খালি পায়ে চলা। ২. মোটা কাপড় পরিধান করা। ৩. মোটা খাবার খাওয়া।

জুতা হারিয়ে গেছে, আর কিনব না; একটা ঝামেলা কমল। টাকা নেই, নাস্তা করব না। আগে মানুষ এক বেলা খানা খেতো, পরে দুই বেলা হলো। তারপর তিন বেলা, তারপর চার বেলা। আর এখন? যখন-ই পায়, তখন-ই খায়।

মসজিদকে আঁকড়ানো। জামাতকে আঁকড়ানো। দাওয়াত, তা'লীম, খাওয়া, শোওয়া– এই চার কাজে একসাথে থাকা। মসজিদ সংশ্লিষ্ট যত আমল আছে ৪০ দিনের মধ্যে না ছুটে। একটা আমল ছুটে গেলেও চিল্লার লোকসান হবে। ৫ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলার সাথে হওয়া। ৪০ দিনে ২০০ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলার সাথে হবে। শোয়ার সময় সূরা ফাতিহা পড়া। সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস পড়ে শরীর দম করে শোয়া। আয়াতুল কুরসী পড়ে শোয়া। ঘুমের দু'আ পড়ে শোয়া। ঘুম থেকে উঠেই কালিমায়ে তাইয়িবা পড়া। অতঃপর জাগ্রত হওয়ার দু'আ পড়া। ঘুমের সময় শয়তান তিনটা গিরা দেয়। ঘুম ভাঙার পর কালিমা বা অন্য কোন দু'আ পড়লে একটা গিরা খুলে যায়। উযু করলে আরেকটা গিরা খুলে যায়।

অতঃপর দু' রাকআত নামায পড়লে সব গিরা খুলে যায়।

ঋণগ্রস্ত শান্তিতে ঘুমাতে পারে না। দেখা যায় কারও কোটি টাকার ব্যবসা, আবার তিন কোটি টাকার ঋণ। অধিক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা আর সকালে ঘুমানো ইয়াহুদ-নাসারার তরীকা। এজন্য ইশার পর যথাশীঘ্র ঘুমিয়ে পড়া। সকালে ঘুমাতে নেই। সকালে আল্লাহ রিযিক বণ্টন করেন।

রাতে ১১টা হতে ৩টা অথবা ১০টা হতে ৩টা মোট ৪/৫ ঘণ্টা ঘুমানো। আর দিনে ২/১ ঘণ্টা ঘুমানো। রাতে ১০টা হতে ৪টা অর্থাৎ ৬ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলে দিনে আর ঘুমানোর প্রয়োজন হবে না। যারা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জীবন কাটায় তারা জীবনে কিছু করতে পারে না; না ভালো ছাত্র হতে পারে, না ভালো শিক্ষক আর না ওলী-আল্লাহ। যারা তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহর ওলী হয়ে মরে। তাহাজ্জুদের পর তিলাওয়াত করে নেয়া। ফজরের আযানের পর তিন তাসবীহ আদায় করা। ফজরবাদ গাশত। তারপর নাশতা– চিড়া, মুড়ি, গুড় নয়তো পান্তাভাত। নফস পরাটা খেতে চায়, জিলাপী খেতে চায়। জিলাপীর হাকীকত তো দেখে না। কারিগররা সাধারণত পেশাব, পায়খানা করে ভালোভাবে পানি নেয় না। অনেকে ফরয গোসলও করে না। কড়াই কুকুরে চাটে। দোকানদার আল্লাহওয়ালা। তাবলীগের সাথীদের খেতে মানা করে; বলে, আপনাদের খাওয়া উচিত না।

কাজেই চিড়া, মুড়ি, গুড়।

সাথীদের পালা-বদল করে আমল দেয়া। দেখা যায়, একজন ভালো পাকাতে পারে তো সবসময় সে-ই পাকায়। একজন ভালো বয়ান করতে পারে তো সে-ই বয়ান করে। আবার মাস্টার সাহেব খুসূসী গাশত করতে পারে, তো সে-ই শুধু খুসূসী গাশত করে। এরকম না হয় বরং পালা-বদল করে সবাইকে সব কাজ দেয়া।

তা'লীম করার সময় হাদীস একটা পড়ে বয়ান না করা। হাদীসটি একবার /দু'বার/ তিনবার পড়া। তা'লীমের হালকায় প্রশ্ন নেই। বলুন তো কী বললাম? জ্বী, তা'লীমের হালকায় প্রশ্ন নেই। হাদীস শরীফ বারবার পড়া। তা'লীমের হালকায় বয়ান নেই। তা'লীমের হালকায় সাথীদেরকে ৬ সিফাত শেখানো। এক্ষেত্রে 'মাকসাদ, ফযীলত, হাসিল করার তরীকা' শিরোনামগুলো উল্লেখ করার দরকার নেই। শিরোনাম ছাড়াই কথা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। একটা জামাত চালানো যতোটা মুশকিল, রাষ্ট্র চালানোও এতোটা মুশকিল নয়।

সকাল ৯টা থেকে ১১টা দু'ঘণ্টা তা'লীম। ১ ঘণ্টা কিতাব, আধা ঘণ্টা সূরা মশ্‌ক, আধা ঘণ্টা ৬ সিফাত। ৬ সিফাত নতুন সাথী ৩ মিনিট আর পুরাতন সাথী ৫ মিনিট করে বলবে। এভাবে ৩০ মিনিটে যে কয়জন সম্ভব হয় বলবে। বাকীরা অন্য বেলায় বলবে। আমীর সাহেব খেয়াল রাখবেন– এই মজমায় কোন পুরাতন সাথী যেন আধা ঘণ্টা বয়ান না করে। মনে রাখতে হবে এটা তা'লীম তথা শেখা-শেখানোর মজমা, বয়ানের মজমা নয়। এজন্য সবাইকে সব আমলের সুযোগ দেয়া, সকালে না হলে বিকেলে।

যে ছাগলের ৩টা বাচ্চা তার দুইটা দুধ খায় আর একটা শুধু লাফায়। হুঁশিয়ার মালিক ঐ দুটোর একটাকে ধরে রেখে তিন নম্বরটাকেও দুধ খাওয়ার সুযোগ দেয়। নাহলে ওটা না খেয়ে শুকিয়ে যাবে। এজন্য জামাতের সব সাথীকে সুযোগ দিতে হবে।

জামাতগুলোতে আগে বুড়োর সংখ্যা বেশি ছিল। জওয়ানরা তাদের খেদমত করত। এখন বুড়োদেরকে পছন্দ করা হয় না! এজন্য যারা জওয়ান আছি বুড়ো সাথীদের খেদমত করব। বুড়োদের দরকার আছে। বুড়ো আঙ্গুল ছাড়া কলম ধরা যায় না। বুড়ো আঙ্গুল না থাকলে শত্রুকে ভয় দেখাতে পারবেন? বুড়োদেরকে শুধু যিকির আর সামানা পাহারায় না রাখি। দুই বুড়ো আঙ্গুল দেখালে তা দেখে হাওয়াই জাহাজ ছাড়ে। বিদেশে বুড়ো আঙ্গুল দেখালে খুব খুশি। কনিষ্ঠাঙ্গুল দেখালে তারা নারায হয়। অনুরূপভাবে অশিক্ষিতদের অবহেলা করব না।

বয়ানের দ্বারা নগদ জামাত উঠবে না। জামাত উঠবে গাশতের দ্বারা। মাগরিব বাদ আধা ঘণ্টা বয়ান ও আধা ঘণ্টা তাশকীল করে ওয়াক্ত উসূল করা। যারা নাম দেয় তাদের উসূল করা। যারা তাশকীল হয়েছে বাদ ইশা তাদের ঘর চিনে আসা। যাকে উসূল করব তার দু'পাশে দু'জন থাকব–একজন আনসার, একজন মুহাজির। বাদ ইশা উসূলের তাকাযা থাকলে তখনই বিতির না পড়া, উত্তরবঙ্গের কোন কোন এলাকায় বিতির এক রাকাত পড়ে। তারা তো আর আমাদের তিন রাকাত বিতিরের অপেক্ষায় বসে থাকবে না।

প্রত্যেক মসজিদে মাকামী জামাত তৈরি করা। তৈরী থাকলে সেটাকে আরও মজবুত করা। প্রতিটি মসজিদে সপ্তাহে ৩ দিনের জামাত বের করার তারতীব করে দেয়া। এভাবে মাসে চারটি জামাত বের হবে। প্রতি জামাতে ২জন পুরাতন আর ১০ জন নতুন সাথী তৈরি করে বের হওয়া। এই জামাতগুলোর যিম্মাদার ইমাম সাহেবকে না বানানো। তাহলে আর তাবলীগ হবে না। কারণ, তাঁর নানামুখী ব্যস্ততা থাকে। জামাতের যিম্মাদারদেরকে আমীর না বলা। এতে ইমাম সাহেব মনোকষ্ট পেতে পারেন। তিনি মনে করতে পারেন যে, আমীর একট বড় পদ, তাই যিম্মাদার শব্দ ব্যবহার করা।

বেশির ভাগ জামাত দিনে একবার তা'লীম করে। যোহরবাদ তা'লীম করে না। করলেও মাত্র এক হাদীসের তা'লীম করে। কি ব্যাপার, কাকরাইল থেকে কি যোহরবাদ এক হাদীসের তা'লীম করতে বলা হয়? জিজ্ঞেস করলে বলে, মুসুল্লীরা খায়নি, খানা খাবে। আরে, তোমাকে বলেছে নাকি যে, তারা খানা খায় নাই? তোমরা খাও নাই, সেটা বলো! সকাল-বিকাল ২+২ = ৪ (চার) ঘণ্টা তা'লীম হলে সবাই শিখতে পারবে।

এজন্য খেদমতের সাথী সকালে বদলাবে না। ১১টায় দুপুরের খাবার দিতে হবে। সকালের তা'লীম শেষে দস্তরখান লেগে যাবে। বাঙ্গালী এক আজব কওম। শোয়ার সময় বকবক করে, আর বয়ানের সময় ঘুমায়। খায় তো সেখানেও বকবক করে। খাওয়ার পেছনে আধা ঘণ্টা লাগিয়ে দেয়। একটা বড় বস্তা ভরতেও তো এতো সময় লাগে না! এজন্য খানা খেতে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না।

কয়েকটি বিষয়ে যত্নবান হওয়া–

১. আমীরকে মেনে চলা।

২. আপোষে মিল মুহাব্বাত বজায় রাখা।

৩. মনে না চাইলেও ইজতিমায়ী আমলে জোড়া।

৪. চার কাজ বেশি সময় লাগানো- দাওয়াত, তা'লীম, যিকির, নামায।

রেলের জানালায় বাইরের দৃশ্য দেখা– এ তো ভ্রমণকারী।

চার কাজ থেকে বেঁচে থাকা।

১. সওয়াল করা। (মুখে চাইব আল্লাহর কাছে)।

২. মনে মনে সওয়াল করা (অন্তরেও চাইব আল্লাহর কাছে)।

৩. অপব্যয় করব না।

৪. বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস ব্যবহার করব না।

(৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

অভাব-অনটন ও সংকটকালীন কুরবানীর বিধান

মাওলানা মাকসূদুর রহমান

কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কুরবানীর বিধান হযরত আদম আলাহিস সালাম থেকে শুরু করে সকল যুগেই বিদ্যমান ছিল। তবে এর আদায়-পদ্ধতিতে ভিন্নতা ছিল। শরীয়তে মুহাম্মাদিয়ার কুরবানী মিল্লাতে ইবরাহীমের সুন্নাত। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত–

قال أصحاب رسول الله ﷺ: يا رسول الله! ما هذه الاضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم.

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এই কুরবানী কী? (অর্থাৎ এই ইবাদত কি বিশেষভাবে শুধু আমাদেরকে দান করা হয়েছে, না পূর্ববর্তী উম্মতের জন্যও এই বিধান প্রযোজ্য ছিল?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, এটি তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নাত। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩১২৭)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, কুরবানীকে সুন্নাতে ইবরাহীম বলা হলো, অথচ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সন্তান কুরবানী করেছিলেন, আর আমরা করছি পশু কুরবানী। দু'টোর মধ্যে মিল কোথায়? এরপর তিনি বলেন,

ہم کو اضحیہ میں اس قدر ثواب ملے جس قدر ابراہیم علیہ السلام کو ذبح ولد میں ملا تھا، دونوں عملوں کی غایت کی اتحاد کی وجہ سے دونوں عمل کو ایک فرمایا گیا۔

ফলাফলের বিবেচনায় আমাদের পশু কুরবানীকে সুন্নাতে ইবরাহীম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমরা পশু কুরবানী করে ততোটুকু সাওয়াব লাভ করবো যতোটুকু সাওয়াব সন্তান কুরবানী করে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম লাভ করেছিলেন। (খুতুবাতে হাকীমুল উম্মত ১৭/১০৩)

কুরবানীর গুরুত্ব অপরিসীম। কুরবানীর কোন বিকল্প হয় না। সমাজের ব্যাপক অভাব-অনটন কিংবা অন্য কোন সংকট কুরবানীকে রহিত করতে পারে না। কোন দান-সাদকার বিনিময়েও কুরবানী থেকে পরিত্রাণ লাভ হতে পারে না। বর্তমানের ব্যাপক দরিদ্রতাও কুরবানীর বিকল্প তৈরি করতে অক্ষম। কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে জেনে নিলে কুরবানীর গুরুত্ব ও নির্বিকল্পতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এক. কুরবানী শি'আরে ইসলাম, ইসলামের অন্যতম নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

অর্থ: কেউ আল্লাহর শা'আইরকে সম্মান করলে এটা অন্তরস্থ তাকওয়া থেকেই অর্জিত হয়। (সূরা হজ্জ-৩২)।

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম যাহহাক রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, শা'আইর দ্বারা কুরবানীর পশু উদ্দেশ্য।

ইবনে আবী নাজিহ-এর সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তা'যীমে শা'আইর মানে কুরবানীর পশুর যত্ন নিয়ে মোটাতাজা করা। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

সাহাবায়ে কেরাম কুরবানীর পশু লালন-পালন করে হৃষ্টপুষ্ট করতেন। আবূ উমামা ইবনে সাহল রাযি. বলেন,

كنا نسمن الاضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون.

অর্থ: মদীনায় আমরা কুরবানীর পশু লালন-পালন করে মোটাতাজা করতাম। সকল মুসলমান কুরবানীর পশু হৃষ্টপুষ্ট করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৫৫২)

উল্লিখিত আয়াতে কুরবানীকে শা'আইরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শা'আইর হলো–

ما جعل علما على طاعة الله

অর্থ: এমন কিছু যাকে আল্লাহর আনুগত্যের আলামত বা নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। (মু'জামুল মুসতালাহাত ওয়াল আলফাযিহিল ফিকহিয়্যা ২/৩৩৭)

শা'আইরে ইসলামের বিধান হলো–

لو اجتمع اهل المصر او قرية تركه يحاربه الامام.

অর্থ: কোন অঞ্চলের মুসলমান যদি ইসলামের কোন শি'আর পরিত্যাগের ব্যাপারে একমত হয়ে যায় ইসলামী রাষ্ট্রকে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/২২৬)

কুরবানীও ইসলামের একটি শি'আর। বরং মিরআতুল মাফাতীহ গ্রন্থকারের বক্তব্য অনুযায়ী কুরবানী হলো শি'আরে আযম তথা ইসলামের সুমহান নিদর্শন।

বিখ্যাত মালেকী ফকীহ মুহাম্মাদ ইলীশ (মৃত ১২৯৯হি.) বলেন,

وان تركها اهل بلد قوتلوا عليها، لأنها من شعائر الاسلام

অর্থ: যদি কোন শহরবাসী কুরবানী ছেড়ে দেয় তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। কারণ কুরবানী শি'আরে ইসলামের অন্তর্গত। (মিনাহুল জালীল শরহু মুখতাসারিল খলীল ২/৪৬৫)

দুই. কুরবানী একটি ওয়াজিব আমল

কুরবানীর শরয়ী অবস্থান সম্পর্কে কিছু মতভেদ রয়েছে। আমাদের দৃষ্টিতে অধিক বিশুদ্ধ মত হলো, সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আওযায়ী, ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ মনীষীগণ এই মত পোষণ করেছেন।

ইমাম শাওকানী রহ. (১২৫০হি.) কুরবানী সংক্রান্ত দলীল-প্রমাণ বিশ্লেষণের পর বলেন–

وبهذا تعارف ان الحق ما قاله الاقل من كونها واجبة، ولكن هذا الوجوب مقيد بالسنة.

অর্থ: উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা গেলো, কমসংখ্যক উলামায়ে কেরাম যা বলেছেন সেটাই সঠিক। অর্থাৎ কুরবানী করা ওয়াজিব। আর এই ওয়াজিব সুন্নাহ তথা হাদীস দ্বারা সমর্থিত। (আস-সাইলুল জাররার লিশ-শাওকানী)

আর শরীয়তের কোন ওয়াজিব আমল সাধারণ ওজরের কারণে পরিত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই।

তিন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোর সতর্কবার্তা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا.

অর্থ: যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না আসে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩১২৩)

হযরত থানবী রহ. বলেন, ঈদগাহ তো এমন স্থান যেখানে হায়েযগ্রস্ত মহিলা– যাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয় এমনকি এ অবস্থায় কোন নামাযই তাদের দায়িত্বে ফরয নয়– তাকেও ঈদগাহে আসতে বলা হয়েছে। কিন্তু যে

সামর্থ্যবান ব্যক্তি কুরবানী পরিত্যাগ করেছে তাকে নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করা হয়েছে। এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এটা কতো কঠোর সতর্কবার্তা।

তাছাড়া ঈদের তিনদিন কুরবানীর চেয়ে উত্তম কোন আমল আর নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا.

অর্থ: কুরবানীর দিনে আমলসমূহের মধ্য থেকে পশু কুরবানী করার চেয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট আর কোন আমল অধিক প্রিয় নয়। কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশুকে তার শিং, পশম ও ক্ষুরসহ উপস্থিত করা হবে। আর কুরবানীর রক্ত যমীনে পড়ার আগেই আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে কুরবানী কর। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১৪৯৩)

বোঝা গেলো, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার প্রিয়তম আমল কুরবানী ছেড়ে দেওয়া অনেক বড় মাহরূমী ও বঞ্চিত হওয়ার কারণ।

চার. সমাজে অর্থ-সঙ্কটের ব্যাপকতাও সামর্থ্যবানের কুরবানী রহিত করতে পারে না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন দরিদ্রতা ব্যাপক ছিল। ঘরে ঘরে অনাহারের কষ্ট চলছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরেও মাসের পর মাস (রান্নার জন্য) চুলা জ্বলত না। আম্মাজান আয়েশা রাযি. বলেন–

إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت يا خالة ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء.

অর্থ: আমরা একমাসে নতুন চাঁদ দেখতাম, অতঃপর আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে পূর্ণ দুই মাস তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরগুলোতে (রান্নার) আগুন জ্বালানোর সুযোগ হতো না। অভাবের কারণে খেজুর-পানি দ্বারাই মাসের পর মাস জীবনধারণ করতে হতো। (সহীহ বুখারী; হাদীস ২৫৬৭)

এই অভাব-অনটন ও চরম খাদ্য-সংকটকালেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল দেখুন। হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন–

اقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দশ বছরই কুরবানী করেছেন। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৪৯৫৫)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে তখন এই যুক্তি শেখাননি যে, সমাজের মানুষ অভাবী তাই সামর্থ্যবানরা কুরবানী বাদ দিয়ে দান-সদকা করো। বরং এমন সংকটকালীনও নিজে কুরবানী করে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কুরবানীর দিনগুলোতে সামর্থ্যবানের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশে সদকার পরিবর্তে কুরবানী করাই উচিৎ।

লেখক: পেশ ইমাম, পার্ক জামে মসজিদ, ৭নং সেক্টর, উত্তরা, ঢাকা।
সিনিয়র মুহাদ্দিস, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী, উত্তরা, ঢাকা।

(৩২ পৃষ্ঠার পর; তাবলীগী বয়ান)

নিজের মাল নিজে হেফাযত করাই ভালো। অপরিচিত লোকের কাছে না রাখা। আমীর সাহেবের কাছেও জমা না রাখা। আমীর সাহেবের পকেট থেকে চুরি হয়েছে তো এখন সন্দেহে পড়ে। শুধু খানার টাকা জমা দেয়া। তা-ও পরিচিতের কাছে রাখা বা আমীর সাহেবের কাছে রাখা। যার সাথে টাকা পয়সা নেই তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া। যদি বলে, 'আল্লাহ দিবেন' তাকে বলা যে, 'ঠিক আছে নিয়ে আসো'। বেহুদা খরচ না করা। সামনের সিট নেয়ার চেষ্টা করা। যে ধোঁকা খায় বা ধোঁকা দেয় উভয়ের মধ্যে ঈমানের কমতি আছে।

সফরে গাড়ি থেকে নেমে নামায পড়তে হলে সংক্ষেপে নামায পড়ব। এক্ষেত্রে ফজর নামাযের সুন্নাত পড়ব। অন্য নামাযের সুন্নত পড়ব না। নয়তো পরবর্তীতে চালকেরা গাড়ি থামাবে না। .... (দু'আ)।

১৯৮১ সালের ২৮শে মার্চের বয়ান হতে
স্থান: কাকরাইল মসজিদ।
তারিখ: ২৮ মার্চ ১৯৮১, শনিবার বাদ যোহর।

আল্লাহ তা'আলার দেয়ার জন্য বান্দার যোগ্যতার প্রশ্ন নেই। যাকে দিবেন সেটাই যোগ্যতা। "কবুলিয়তের জন্য কাবিলিয়্যাত শর্ত নয়।" এই শের (কবিতা) হযরতজী ইলয়াস রহ. সর্বদা পড়তেন।

যোগ্যতা হচ্ছে আল্লাহ পাকের কাছে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করা। হযরত আবূ বকর রাযি.-এর মতো যোগ্যতম ব্যক্তিও নামায শেষে নিজের কমজোরি স্বীকার করেছেন।

শয়তানের সবচেয়ে বড় ধোঁকা হলো দ্বীনের মেহনত করনেওয়ালার মধ্যে আত্মগর্ব সৃষ্টি করা। অথচ বুযুর্গীর হাকীকত হলো আল্লাহ পাকের সামনে নিজের কসুর ও কমজোরী স্বীকার করা। নিজের নফসের ব্যাপারে যে যতো বেশি যুলুমের স্বীকারোক্তি দিবে সে ততো বেশি বেলায়েতের মাকাম লাভ করবে।

১৯৮১ সালের ২৯শে মার্চের বয়ান হতে
স্থান: কাকরাইল মসজিদ। ২৯ মার্চ ১৯৮১, রবিবার বাদ যোহর।

মুরুব্বীদের দোষ তালাশে লেগে গেলে মনে করতে হবে তাবলীগ থেকে বিদায় হওয়ার সময় খুব কাছে। খোশখবরী ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিজের দোষ তালাশে এতো লেগে গেছে যে, অন্যের দোষ তালাশের অবসর পায় না। মাল ও ইজ্জতের মহব্বত দ্বীনদারের জন্য ক্ষুধার্ত বাঘ ভেড়ার পালে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেয়ে বেশি ভয়ংকর। রাজত্বের মালিক একমাত্র তিনিই। বাকী সবকিছু ধোঁকা প্রমাণিত হবে। তখন দ্বীনের সাথে নিসবতের (সম্পর্ক গড়ার) গুরুত্ব বুঝা যাবে। শুকরিয়া স্বরূপ জানমালের বাজি লাগাতে হবে। বাজি লাগাবার পরও মনে করতে হবে যে, কিছুই করতে পারিনি। এমন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের কাছে অতি প্রিয়। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক বলবেন, এই বান্দা তার সমস্ত জান-মাল আমার জন্যে লাগিয়েছে। আমিও তাকে আমার শান মোতাবেক দান করব। ইলমের উপর যেন ফখর (অহংকার) না হয়। সব আমলের সাথে ইস্তিগফার থাকা চাই। মুজাহাদা করতে করতে সবচেয়ে শেষে যে জিনিস নফস থেকে বের হয় তা হচ্ছে ইজ্জত-সম্মানের লোভ।

(চলমান)

[বি. দ্র. আয়াত-হাদীসসমূহের ইবারাত-হাওয়ালা অক্ষরবিন্যাসকারী কর্তৃক সংযোজিত ও অনূদিত। অক্ষরবিন্যাসকারী– জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া থেকে হিফয, দাওরা ও ইফতা সমাপনকারী মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম (বয়ান লেখকের মেঝো সাহেবযাদা)]

আরাফার রোযার দিনক্ষণ: একটি ভ্রান্তির নিরসন

মাওলানা মাহদী হাসান মাহমুদ মানিকগঞ্জী

যিলহজ্জ মাসের নবম দিনটি 'আরাফার দিন' নামে প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

عن أبي قتادة عن النبي ﷺ قال صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

অর্থ: আরাফার দিনের রোযার ব্যাপারে আমি আশা করি, (আল্লাহ তা'আলা এই রোযা আদায়কারীর) অতীত ও ভবিষ্যতের এক-এক বছরের গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১১৬২)

কিন্তু আরাফার এই ফযীলতপূর্ণ রোযাটি আমরা কবে রাখব? সৌদী আরবে উদিত চাঁদের ৯ই যিলহজ্জ (যেদিন হাজীগণ আরাফার ময়দানে সমবেত হয়ে থাকেন) চাই নিজ দেশে সে দিন যিলহজ্জের যে তারিখই হোক না কেন, নাকি নিজ দেশে উদিত চাঁদের ৯ই যিলহজ্জ? উত্তর হলো, অন্যান্য রোযা ও ইবাদতের ন্যায় আরাফার রোযাও নিজ দেশের চাঁদ ও সময় অনুযায়ী রাখব। কিন্তু দুঃখজনক-ভাবে এ ব্যাপারে কিছু লোক বিভ্রান্তির শিকার হন। তারা অন্যান্য রোযা ও ইবাদত নিজ নিজ দেশের সময় ও চাঁদের তারিখ অনুযায়ী পালন করলেও শুধু এই রোযাটির তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সৌদী-চাঁদের অনুসরণ করে থাকেন। তাদের যুক্তি হলো, হাদীস শরীফে উক্ত রোযাটি 'আরাফার দিন' রাখতে বলা হয়েছে। আর ৯ই যিলহজ্জ হাজীদের আরাফায় সমবেত হওয়ার আমলটি শুধুমাত্র সৌদীতেই সংঘটিত হয়। অতএব আরাফার রোযাটি সৌদীর চাঁদ অনুযায়ীই রাখতে হবে। এ নিবন্ধে তাদের উল্লিখিত দাবীর অসারতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

'আরাফার দিন' ৯ই যিলহজ্জের পারিভাষিক নাম

দলীল-১: হাদীসে উল্লিখিত আরাফার দিন দ্বারা মূলত ৯ই যিলহজ্জ উদ্দেশ্য। এটা মূলত যিলহজ্জের ৯ তারিখের পারিভাষিক নাম। যেমন 'আশুরা' ১০ই মুহাররমের পারিভাষিক নাম; আশুরার দিনে সংঘটিত ঘটনাবলীর স্থানগত নাম নয়। অনুরূপ শবে মিরাজ বা লাইলাতুল মিরাজ শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজ রজনীর স্থানগত নাম নয়; বরং এটি ২৭ই রজবের একটি পারিভাষিক নাম। এ কারণেই পৃথিবীর সর্বত্র স্থানীয় চাঁদের তারিখ অনুযায়ী এই দিনগুলো তার পারিভাষিক নামের সঙ্গে পরিচিত। তদ্রূপ হাদীসে উল্লিখিত 'ইয়াওমে আরাফা' বা আরাফার দিন দ্বারা আরাফার ময়দানে হাজীদের সমবেত হওয়ার মুহূর্ত উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া এই রোযাটি আরাফার ময়দান সংক্রান্ত কোন বিধানও নয়। বরং এই দিনে আরাফার ময়দানে হাজীদের জন্য উক্ত রোযাটি না রাখাই মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার ময়দানে এই রোযা রাখেননি। উম্মে ফযল রাযি. বলেন,

شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي ﷺ بشراب فشربه.

অর্থ: আরাফার দিন আরাফার ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাটি রেখেছেন কিনা এ ব্যাপারে লোকজন দ্বিধাগ্রস্ত হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পানীয় পাঠালাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ১৬৫৮)

তাছাড়া আরাফার রোযার তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে কিছু হাদীসে 'আরাফার দিন' বলা হয়েছে, তদ্রুপ কিছু হাদীসে '৯ই যিলহজ্জ' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আরাফার দিন না বলে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে–

عن بعض نساء النبي ﷺ كان يصوم ... تسعا من ذي الحجة.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার রোযা ৯ই যিলহজ্জ রাখতেন। (সুনানে আবূ দাঊদ; হাদীস ২৪৩৭, সুনানে নাসায়ী; হাদীস ২৩৭২)

মোটকথা, আরাফার রোযা সম্পর্কিত হাদীসে 'আরাফার দিন' দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা অস্পষ্ট ছিল। ফলে এখানে 'হাজীদের আরাফায় সমবেত হওয়ার দিন' এবং '৯ই যিলহজ্জ' দু'টি সম্ভাবনাই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অপরাপর হাদীস যেখানে স্পষ্ট শব্দে '৯ই যিলহজ্জ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর দ্বারা '৯ই যিলহজ্জ' হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং শুধুমাত্র যুক্তির ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল দ্বারা স্পষ্টকৃত বিষয়ের ভিন্ন অর্থ নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

দলীল-২:

আরাফার দিন ৯ই যিলহজ্জের পারিভাষিক নাম হওয়ায় এই দিন সংক্রান্ত অন্যান্য যতো হাদীস রয়েছে সব ক্ষেত্রে আরাফার দিন বলে ৯ই যিলহজ্জ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। যেমন তাকবীরে তাশরীক বিষয়ক হাদীসগুলোতেও আমলটি ৯ই যিলহজ্জ থেকে শুরু হওয়ায় দিনটিকে আরাফার দিন বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে–

عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر أيام التشريق ويكبر بعد صلاة العصر.

অর্থ: হযরত আলী রাযি. আরাফার দিন ফজর হতে তাকবীরে তাশরীক আদায়ের শেষদিন আসর পর্যন্ত (প্রত্যেক নামাযের পর) তাকবীরে তাশরীক আদায় করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা; হাদীস ৫৬৭৭)

আর এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, তাকবীরে তাশরীকের আমলটি প্রত্যেকে তার নিজ দেশের চাঁদের তারিখ অনুযায়ী ৯ই যিলহজ্জ থেকে শুরু করে। এমনকি যারা আরাফার রোযাটি সৌদীর সঙ্গে মিলিয়ে রাখার প্রবক্তা তারাও। যখন রোযা ও তাকবীরে তাশরীক উভয় বিষয়ের হাদীসে আমলগুলোর দিন নির্ধারণ 'আরাফার দিন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, তখন রোযার ক্ষেত্রে 'আরাফার দিন' দ্বারা আরাফার ময়দানে হাজীদের সমবেত হওয়ার মুহূর্ত অর্থাৎ সৌদিচাঁদের ৯ই যিলহজ্জ আর তাকবীরে তাশরীকের ক্ষেত্রে নিজ দেশের ৯ই যিলহজ্জ উদ্দেশ্য নেয়ার দ্বিমুখী আচরণের কী যুক্তি আছে?

দলীল-৩:

(ক) যত স্থানে আরাফার দিনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে সবখানেই এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, এটি যিলহজ্জের ৯ তারিখ। যেমন আল-মুগনী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। (আল-মুগনী ৩/১৭৫)

فأما يوم عرفة فهو اليوم التاسع من ذي الحجة.

কোথাও এমনটি উল্লেখ নেই যে, আরাফার দিন শুধু সৌদি চাঁদের ৯ই যিলহজ্জকে বলে।

(খ) ৯ই যিলহজ্জকে আরাফার দিন শুধু এজন্য বলা হয় না যে, এদিন হাজীগণ আরাফার ময়দানে সমবেত হন। বরং এটি তার একাধিক কারণের একটি। মূলত ৯ই যিলহজ্জ একটি ঐতিহাসিক দিন। এর রয়েছে একাধিক বৈশিষ্ট্য। সে হিসেবে সবগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই দিনটিকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। আল-মুগনী গ্রন্থে উল্লিখিত নিম্নলিখিত বক্তব্যটি লক্ষ করুন–

فأما يوم عرفة فهو اليوم التاسع من ذي الحجة سمي بذلك لأن الوقوف بعرفة فيه وقيل سمي يوم عرفة لأن إبراهيم عليه السلام أري في المنام ليلة التروية أنه يؤمر بذبح ابنه فأصبح يومه يتروى هل هذا من الله أو حلم فسمي يوم التروية فلما

كانت الليلة الثانية رآه أيضا فأصبح يوم عرفة فعرف أنه من الله فسمي يوم عرفة.

এই বক্তব্যে ৯ই যিলহজ্জকে আরাফার দিন নামকরণে দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো, এদিন আরাফার ময়দানে হাজীগণ সমবেত হন। আর দ্বিতীয়টি হলো, ৮ই যিলহজ্জ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বপ্নে দেখেন, তাকে তার পুত্র কুরবানীর আদেশ দেয়া হচ্ছে। তিনি জাগ্রত হয়ে সারাদিন দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে, আদেশটি আল্লাহর পক্ষ হতে ছিল কিনা। এজন্যই ৮ই যিলহজ্জকে ইয়াওমুত তারবিয়া বা সংশয়ের দিন বলা হয়। অতঃপর ৯ই যিলহজ্জ পুনরায় তিনি একই স্বপ্ন দেখেন। তখন তিনি নিশ্চিত হন যে, আদেশটি আল্লাহর পক্ষ হতেই ছিল। সে জন্য এ দিনকে আরাফার দিন নামকরণ করা হয়েছে। কেননা আরাফা শব্দের অর্থ জানা, পরিচয় লাভ করা। (আল-মুগনী ৩/১৭৫)

আরাফার দিনকে 'ইয়াওমে আরাফা' নামকরণের যদিও দু'টি কারণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি বেশি যথার্থ মনে হয়। কেননা হাজীগণ আরাফার ময়দান ব্যতীত আরও দুই স্থানে হজ্জের কার্যাবলী পালনের জন্য সমবেত হয়ে থাকেন। একটি মিনায় ৮ই যিলহজ্জ, অপরটি মুযদালিফায় ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত্রিতে। অথচ এই দুই স্থানকে কেন্দ্র করে ঐ দিনগুলোর নামকরণ করা হয়নি। অর্থাৎ, কেউ ৮ই যিলহজ্জকে ইয়াওমুল মিনা এবং ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতকে ইয়াওমুল মুযদালিফা বলে না। পক্ষান্তরে আমরা দেখছি যে, ৮ই যিলহজ্জকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনাটির স্মরণে ইওয়ামুত তারবিয়া নামকরণ করা হয়েছে। যেমন এক হাদীসে এসেছে–

عن رفيع قال سألت أنس بن مالك اخبرني بشيئ عقلته عن النبي ﷺ اين صلى الظهر والعصر يوم التربية؟ قال: بمنى ...الخ

অর্থ: হযরত আনাস রাযি. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইওয়ামুত তারবিয়া'র দিন কোথায় যোহর ও আসর নামায আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মিনায় আদায় করেছেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ১৬৫৩)

এছাড়াও হজ্জের প্রায় সবগুলো বিধানের মাধ্যমেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্মৃতিচারণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে যে, ৯ই যিলহজ্জকে আরাফার দিন বলে নামকরণ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উক্ত ঘটনাটির স্মরণে হয়ে থাকবে। বোঝা গেলো, এটি কোন বিশেষ স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থানীয় দিনের নাম নয়। বরং এটি একটি ঐতিহাসিক দিন, যা পৃথিবীর সর্বত্র স্থানীয় চাঁদের ৯ই যিলহজ্জ। এজন্যই পৃথিবীর সর্বত্র স্থানীয় ৯ই যিলহজ্জকে আরাফার দিন বলা হয়।

আরাফার দিনকে ৯ই যিলহজ্জের পারিভাষিক নাম স্বীকার না করার ক্ষেত্রে কিছু অমীমাংসিত সমস্যা ও প্রশ্ন

০১. পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ রয়েছে যেখানে সৌদির একদিন পূর্বেই চাঁদ দেখা যায়। সৌদির ৯ই যিলহজ্জ (আরাফার দিন) তাদের সেখানে ১০ ই যিলহজ্জ অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন। তারা যদি সৌদির তারিখ অনুযায়ী রোযাটি রাখে তাহলে তাদের ঈদের দিন রোযা রাখতে হবে। অথচ ঈদের দিন রোযা রাখা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয নেই। হাদীস শরীফে এসেছে–

عن أبي سعيد الخدري ﷺ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صوم في يومين الفطر والأضحى ... الخ.

অর্থ: দুই দিন রোযা রাখা নিষেধ; ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। (সহীহ বুখারী; হাদীস ১৯৯৫)

এখন তারা ঈদের দিন রোযা রেখে একটি গর্হিত কাজে লিপ্ত হবেন, নাকি এই ফযীলতপূর্ণ রোযাটি ছেড়ে দিবেন? যদি ছেড়ে দেন তাহলে তারা কী অপরাধ করেছেন, যার জন্য প্রতি বছর তারা এই ফযীলতপূর্ণ রোযা থেকে বঞ্চিত হবেন?

০২. এমন অনেক দেশ রয়েছে, যেখানে সৌদিতে যখন দিন সেখানে তখন রাত। যেমন অস্ট্রেলিয়া এবং (+৯:৪৫), নিউজিল্যান্ড (+৯:৪৫), ইউএসএ (-১১:৩০) ইত্যাদি, এরা কিভাবে সৌদির আরাফার দিন রোযা রাখবেন?

০৩. বাংলাদেশসহ যে সমস্ত দেশে সময়ের সাথে সৌদির সময়ের তিন থেকে ছয় ঘণ্টা পার্থক্য রয়েছে এ অঞ্চলগুলোর যারা সৌদির তারিখ অনুযায়ী রোযাটি রাখার প্রবক্তা, তারা শুধু সৌদির তারিখের অনুসরণ করেন কিন্তু (ঘড়ির) সময়ের ক্ষেত্রে তারা নিজ দেশের সময়ের অনুসরণ করেন। এ পার্থক্যের কারণ কী? অথচ দুটোর ক্ষেত্রেই শরীয়তের নির্দেশ হলো নিজ নিজ অঞ্চলের অনুসরণ করা। এখন আরাফার রোযা যদি আরাফার ময়দানে হাজীদের সমবেত হওয়ার মুহূর্তেই রাখতে হয় এবং এর জন্য সৌদির অনুসরণ করতে হয় তাহলে তারিখ ও সময় উভয় ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা উচিৎ।

০৪. বর্তমান বা নিকট-অতীতের আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম আবিষ্কারের পূর্বে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক কঠিন ছিল ফলে সৌদি থেকে দূরবর্তী যে সমস্ত অঞ্চলে ১০ থেকে ১২ দিনেও সৌদি-চাঁদের সংবাদ পৌঁছানো সম্ভব ছিল না, তখন এ সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা কোন তারিখ অনুযায়ী রোযাটি রাখতেন?

সকল প্রকার রোযার তারিখ নির্ধারণে শরীয়তের মূলনীতি

রোযার তারিখ নির্ধারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা (রমাযান) মাসটি পাবে, তারা যেন অবশ্যই রোযা রাখে। (সূরা বাকারা-১৮৫)

উল্লিখিত আয়াত যদিও রমাযানের রোযার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এই মূলনীতি ফরয, নফল সকল রোযার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেটা হলো, 'প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ অঞ্চলের চাঁদের তারিখ অনুযায়ী রোযা রাখবে।' হাদীস শরীফে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ... الخ

অর্থ: তোমরা চাঁদ দেখা ব্যতীত রোযা রাখবে না। (সহীহ বুখারী; হাদীস ১৯০৬)

সাহাবায়ে কেরামের আমলও এমনটি ছিল। নিম্নলিখিত হাদীসটি লক্ষ্য করুন–

عن كريب ... فسألنى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت أولا تكتفى برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ, একবার সিরিয়ার লোকেরা জুমু'আর দিন রমাযানের চাঁদ দেখে এবং সে হিসেবে তারা হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর নির্দেশে রোযা রাখে। কিন্তু মদীনাবাসীরা শনিবার চাঁদ দেখে এবং তারা সে হিসেবেই রোযা রাখে। পরবর্তী সময়ে মদীনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. সিরিয়ার সংবাদ শোনার পরও মদীনাবাসীকে মদীনার চাঁদের হিসেবেই রোযা পূর্ণ করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই শিক্ষা দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১০৮৭)

সারকথা, বহুসংখ্যক আয়াত, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা এটিই প্রমাণিত যে, প্রত্যেকেই তার নিজ এলাকার চাঁদের তারিখ অনুযায়ী সকল প্রকার রোযা পালন করবে। সে হিসেবে আরাফার দিনের রোযাটিও নিজ নিজ দেশের চাঁদের তারিখ অনুযায়ী ৯ই যিলহজ্জ পালন করবে; সৌদী-চাঁদের তারিখ অনুযায়ী নয়।

শিক্ষার্থী: উলূমুল হাদীস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

কুরআন, হাদীস ও আম্বিয়ায়ে কেরামের ব্যাপারে

মির্জা কাদিয়ানীর মিথ্যাচারিতার লা-জওয়াব প্রমাণ

মাওলানা ইরফান জিয়া

কাদিয়ানীদের ক্রমবর্ধমান অপতৎপরতার কারণে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী'র নাম অনেকের কাছেই পরিচিত। মির্যার বক্তব্য অনুযায়ী সে ১৯৩৯ অথবা ১৯৪০ সালে ভারতের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে। (কিতাবুল বারিয়্যাহ ১৫৯, রুহানী খাযায়েন ১৩/১৭৭)

এর প্রায় ৬৮ বছর পর ১৯০৮ সালের ২৬ মে মারা যায়।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার জীবনে বিভিন্ন ধরনের দাবী করেছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– বাইতুল্লাহ হওয়ার দাবী, মুজাদ্দেদ হওয়ার দাবী, মামুর মিনাল্লাহ হওয়ার দাবী, আদম, মারইয়াম এবং আহমাদ হওয়ার দাবী, মাসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবী, যিল্লী ও বুরুযী নবী হওয়ার দাবী, পরিপূর্ণ শরীয়ত বিশিষ্ট নবী ও রাসূল হওয়ার দাবী ইত্যাদি। মির্যার প্রত্যেকটি দাবীই আলাদাভাবে আলোচনার অবকাশ রাখে। কিন্তু এসব দাবীর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো নবুয়তের দাবী।

মুসলমান মাত্রই জানেন যে, আমাদের নবীজী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন্নাবীয়ীন, আখেরী নবী। তারপর আর কোনো নবী হওয়া সম্ভব নয়। কুরআন হাদীসে এর সুস্পষ্ট দলীল আছে। কাদিয়ানী ফেতনা মোকাবেলা করার জন্য খতমে নবুয়তের সেসব দলীল আমাদের জেনে রাখা আবশ্যক।

তবে এই লেখায় সেসব দলীল আলোচনা না করে শুধু মির্যার মিথ্যাবাদী হওয়ার বিষয়টি সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা হবে। যাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ ধরনের একজন মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ, আল্লাহ ও রাসূলের সাথে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী ব্যক্তির জন্য– মুজাদ্দিদ, মাসীহ, মাহদী হওয়া তো দূরের কথা; একজন ভালো মানুষের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হওয়াও সম্ভব নয়। আর নবী-রাসূল হওয়ার কথা তো কল্পনাও করা যায় না।

মিথ্যার ব্যাপারে মির্যার নীতি

মিথ্যা ও মিথ্যুকের বিধান সম্পর্কে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনেক বক্তব্য রয়েছে। মির্যার মিথ্যার বেসাতির বর্ণনা দেওয়ার আগে আমরা মিথ্যা সম্পর্কে মির্যা কাদিয়ানীর কিছু বক্তব্য উল্লেখ করছি। এ সকল বক্তব্য দ্বারা মিথ্যার ব্যাপারে মির্যা কাদিয়ানীর মূলনীতি স্পষ্ট হবে।

جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں

'মিথ্যা কথা বলা মুরতাদ হওয়ার চেয়ে কম নয়।' (যমীমা তোহফায়ে গোলড়াবিয়া, রুহানী খাযায়েন ১৭/৫৬)

جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی کام نہیں

'মিথ্যা বলার চেয়ে মন্দ কাজ দুনিয়াতে আর কিছু নেই।' (তাতিম্মা হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন ২২/৪৫৯)

جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا برابر ہے

'মিথ্যা কথা বলা আর মল খাওয়া একই কথা।' (হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন ২২/২১৫)

ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے مجھ کو ہوئی ہے۔ ایسا بدذات انسان تو کتوں اور سؤروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے

'এমন মানুষ যে দিন রাত আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলে এবং নিজের পক্ষ থেকে একটা কথা বানিয়ে বলে যে, এটা আল্লাহর ওহী, আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এমন বজ্জাত মানুষ তো কুকুর, শুকর এবং বানর থেকেও নিকৃষ্ট।' (যমীমা বারাহীনে আহমাদিয়া, ৫ম খণ্ড, রুহানী খাযায়েন ২১/২৯২)

মির্যার মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রমাণ

এবার আমরা ধারাবাহিকভাবে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মিথ্যা কথার কিছু নমুনা দেখবো। এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই অকাট্য মিথ্যা; যেগুলোর ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মির্যা বা তার অনুসারীরা মুখই খোলতে পারেনি। আর কয়েকটির ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেও আজ পর্যন্ত কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

এক.

মির্যা কাদিয়ানী বলেছে–

تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے مکہ اور مدینہ اور قادیان

'তিনটি শহরের নাম সম্মানের সাথে কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কা , মদীনা ও কাদিয়ান।' (ইযালায়ে আওহাম: ৩৪, রুহানী খাযায়েন ৩/১৪০)

পাঠক, আপনি নিশ্চিত থাকুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবীজী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন সে কুরআনের কোথাও কাদিয়ান শহরের কথা উল্লেখ নেই; থাকার কথাও নয়। তবে ইবলীস শয়তান মির্যা কাদিয়ানীর উপর কোনো কিছু অবতীর্ণ করে থাকলে সেখানে কাদিয়ান শহরের কথা থাকলে থাকতেও পারে।

দুই.

মির্যা কাদিয়ানী বলেছে–

تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایساں ہی قرآن شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے لے کر اخیر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے

'সকল নবীর কিতাব এবং কুরআন শরীফ থেকেও এটা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করেছেন ৭ হাজার বছর।' (লেকচারে শিয়ালকোট, রুহানী খাযায়েন ২০/২০৭)

কাদিয়ানীর এই কথা একেবারেই মিথ্যা। পৃথিবীর বয়স কতো হবে তা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের কোথাও এটা উল্লেখ করেননি। কিয়ামত পর্যন্ত কাদিয়ানীরা এই দাবীর পক্ষে কুরআন শরীফ থেকে কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারবে না।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

'নিশ্চয়ই কিয়ামতের (সময় সম্পর্কে) ইলম একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জানেন যে, মাতৃগর্ভে কী লালিত হচ্ছে। কেউই জানে না যে, আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে। কেউই জানে না যে, সে কোন যমীনে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহই সকল জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনি সব কিছু জানেন।' (সূরা লুকমান-৩৪)

আশ্চর্যের বিষয় হলো– এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে ক'টি বিষয় মানুষ জানে না বলে ইরশাদ করেছেন; তার প্রায় সবক'টিই মির্যা কাদিয়ানী জানে বলে দাবী করেছে। এগুলোর মধ্যে কিয়ামতের আলোচনা তো আগেই গেলো। পাশাপাশি মির্যা তার এক মুরীদের স্ত্রীর গর্ভের সন্তানের ব্যাপারে আগে থেকেই বলে দিয়েছিলো এবং নিজের মৃত্যু কোথায় হবে সেই ব্যাপারেও ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলো। যদিও এ দু'টি বিষয়ের একটিতেও সে সত্যবাবাদী প্রমাণিত হয়নি।

তিন.

মির্যা কাদিয়ানী বলেছে–

اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہے مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ هذا خليفة الله المهدى۔اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔

'যদি হাদীসের উপর ভরসা করা হয় তাহলে প্রথমে সেসকল হাদীসের উপর আমল করা উচিৎ যেগুলো সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে এই হাদীস থেকে কয়েকগুণ এগিয়ে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বুখারী শরীফের ঐ সকল হাদীস যেগুলোতে শেষ জমানার কিছু খলীফার ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ঐ খলীফা, যার ব্যাপারে বুখারীতে আছে যে, তার ব্যাপারে আকাশ থেকে আওয়াজ আসবে هذا خليفة الله المهدى এখন চিন্তা করো, এই হাদীসের মর্যাদা কতো বেশি, যেটা اصح الكتب بعد كتاب الله অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে সহীহ গ্রন্থ (বুখারীতে) আছে।' (শাহাদাতুল কুরআন, রুহানী খাযায়েন ৬/৩৩৭)

উপর্যুক্ত হাদীসটি বুখারী শরীফে থাকার দাবীটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বুখারী তো দূরের কথা পুরো সিহাহ সিত্তায় এই হাদীসটি নেই।

মির্যার অনুসারীরা তার এই মিথ্যার ব্যাখ্যায় বলে, 'বুখারীতে না থাকলেও এটি তো হাদীসের অন্যান্য কিতাবে আছে তাই মির্যাকে মিথাবাদী বলা যাবে না।'

দেখুন, কী হাস্যকর যুক্তি! এতো ঢাকঢোল পিটিয়ে দাবী করা হলো, বুখারীতে আছে। এখন নাকি অন্য কিতাবে থাকলেও কথা সত্য হয়ে যাবে। অনেক সময় তারা বলে, এটা আসলে লিপিকারের ভুল। আমাদের হযরত কিতাবের নাম বুখারী লেখেননি। লিপিকার ভুলে বুখারী লিখে ফেলেছে।'

তাদের এ দাবীটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মির্যা বুখারী না লিখে থাকলে পরে এই কথা লিখতো না– 'এখন চিন্তা করো, এই হাদীসের মর্যাদা কী পরিমাণ, যেটা اصح الكتب بعد كتاب الله 'আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে সহীহ গ্রন্থে আছে'। কারণ اصح الكتب بعد كتاب الله এটা বুখারীর ব্যাপারেই বলা হয়।

এই পর্যায়ে এসে কাদিয়ানীরা বলে– 'হযরত বিস্মৃতির কারণে এ কথা বলে ফেলেছেন। আপনাদের উলামায়ে কেরাম থেকেও তো এমন ভুল হয়ে যায়। তারাও তো বিভিন্ন সময় এক কিতাবের স্থানে অন্য কিতাবের নাম লিখে দেন।'

মির্যা কাদিয়ানীর অনুসারীগণ! ভালোভাবে মনে রাখুন, আমাদের কোনো আলেম নিজেকে নবী দাবী করেননি। সুতরাং তাদের পক্ষ থেকে এমন ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মির্যা তো নবুয়ত দাবী করেছে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদামতে নবীগণ বিস্মৃতির উপর অটল থাকতে পারেন না। এমনকি মির্যা নিজেও দাবী করেছে যে, 'রুহুল কুদসের শক্তি প্রতি মুহূর্তে তার সকল বিষয়ে সহযোগিতা করতে থাকে'। (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, হাশিয়া রুহানী খাযায়েন ৫/৯৩)

সুতরাং রুহুল কুদসের শক্তিপ্রাপ্ত একজন নবী (লা'নাতুল্লাহি আলাইহি) কিভাবে এমন ভুল করতে পারলেন? আর শুধু ভুল করেই শেষ নয়। ১৮৯৩ সালে এই বক্তব্য প্রদানের পর থেকে প্রায় ১৫ বছর সেই ভুলের উপরই অটল থাকতে পারলেন?

বোঝা গেলো, মির্যা কাদিয়ানী একজন মিথ্যুক ছাড়া কিছুই নয়। সে সত্য নবী হলে এ ধরনের মিথ্যা রেফারেন্স কিছুতেই পেশ করতো না এবং এর উপর আমৃত্যু অটল থাকতো না।

চার.

মির্যা কাদিয়ানী বলেছে–

تاریخ داں لوگ جانتے ہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب فوت ہو گئے تھے

'ইতিহাসে বিশারদগণ জানেন যে, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঔরসে ১১ জন ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিলো এবং সবাই মৃত্যুবরণ করেছিলো।' (চশমায়ে মারেফত ২৮৬, রুহানী খাযায়েন ২৩/২৯৯)

কাদিয়ানীর অনুসারীগণ! ইতিহাস বিশারদগণ তো দূরের কথা, মাত্র একজন ঐতিহাসিকের বক্তব্য পেশ করুন যিনি নবীজীর এগারোজন ছেলে জন্মগ্রহণ করার দাবী করেছেন। মির্যার এই বক্তব্য সুস্পষ্ট মিথ্যা। নবীজীর সন্তান সংখ্যা নিয়ে সামান্য মতবিরোধ থাকলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে– 'খাদিজা রাযি. এর গর্ভে নবীজীর সন্তান ছিলো ৬ জন। দু'জন ছেলে, চারজন মেয়ে। এর

বাইরে মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে একজন ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিলো।' এদেরকে ছাড়াও নবীজীর আরো কয়েকজন ছেলের কথা বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। তবে সে সকল বর্ণনা একত্র করলেও ছেলের সংখ্যা কখনই **১১** হয় না।

মোটকথা, নবীজীর **১১** জন ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করার দাবী একেবারেই মিথ্যা। এর স্বপক্ষে কাদিয়ানীরা নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে একটি প্রমাণও পেশ করতে সক্ষম হবে না।

পাঁচ

মির্যা কাদিয়ানী বলেছে–

حضرت عیسیٰ اور موسی مکتبوں میں بیٹھتے تھے اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی سے تمام توریت پڑھی تھی

'হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এবং হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম) মক্তবে বসতেন। আর হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) একজন ইয়াহুদী পণ্ডিতের কাছে সম্পূর্ণ তাওরাত পড়েছিলেন।' (আইয়ামুস সুলহ, রুহানী খাযায়েন ১৪/৩৯৪)

এখানে মির্যা দাবী করছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মানুষের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামকে ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন তখন স্পষ্ট বলেছেন যে, ঈসা আলাইহিস সালামকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিবেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানে বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে–

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ

'স্মরণ করুন, যখন ফেরেশতারা বলল, 'হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, যে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'। (সূরা আলে ইমরান-৪৫)

এর একটু পরে বলা হচ্ছে–

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ

'আর তিনি তাকে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দেবেন'। (সূরা আলে ইমরান-৪৮)

কুরআনে কারীমের এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তাওরাতের ইলম আল্লাহ তা'আলাই শিক্ষা দিয়েছিলেন। এর বিপরীতে মক্তবে বসে শিক্ষালাভ করার ব্যাপারে মির্যা কাদিয়ানী কোনো প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং বোঝা গেলো, মির্যার এ দাবীটি কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনার বিপরীত এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা। কাদিয়ানী বা তার অনুসারীদের কেউই আজ পর্যন্ত এই মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতে পারেনি।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মক্তবে বসার ব্যাপারেও মির্যা কাদিয়ানী কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। বরং মির্যার অন্য একটি বক্তব্যে মৌলিকভাবে এর বিপরীত কথা রয়েছে–

اور تمام نفوس قدسیہ انبیا کو بغیر کسی استاد اور اتالیق کے آپ ہی تعلیم اور تادیب فرما کر اپنے فیوض قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا

'আল্লাহ তা'আলা সকল পবিত্রাত্মা নবীকে নিজেই তালীম-তরবিয়ত করে তার চিরন্তন ফয়েজের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।' (বারাহীনে আহমাদিয়া, রুহানী খাযায়েন: ১/১৬)

দেখুন, এখানে মির্যা নিজেই স্বীকার করছে যে, সকল নবীকে আল্লাহ তা'আলা নিজে শিক্ষা দান করেছেন। অন্য জায়গায় আবার মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের মক্তবে বসার দাবী করে স্ববিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে। এই দুই বক্তব্যের যেটাকেই সঠিক ধরা হোক, অন্যটির ব্যাপারে মির্যা মিথ্যুক প্রমাণিত হবে।

পরিশিষ্ট

মির্যার জীবনে মিথ্যার সংখ্যা অনেক। সবগুলো এখানে পেশ করা সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। কারণ, মির্যা নিজেই বলেছে–

ظاہر ہے کہ ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا

'এটা স্পষ্ট যে, কোনো একটি ব্যাপারে কেউ মিথ্যুক প্রমাণিত হলে অন্যান্য বিষয়েও তার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।' (চশমায়ে মারেফাত: ২/২২৩, রুহানী খাযায়েন: ২৩/২৩১)

মির্যার এই বক্তব্য অনুযায়ী তার একটি মিথ্যা উল্লেখ করাই যথেষ্ট ছিলো। তারপরও আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে পাঁচটি মিথ্যা উল্লেখ করলাম। উপর্যুক্ত মিথ্যাগুলো প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পর আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তাকে কোনোরূপ উপাধিতে ভূষিত করছি না। বরং মিথ্যার ব্যাপারে মির্যার মূলনীতিগুলোই আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করে দিচ্ছি–

(ক) মিথ্যা বলা সবচেয়ে খারাপ কাজ।

(খ) মিথ্যা কথা বলা মুরতাদ হওয়ার চেয়ে কম নয়।

(গ) বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলা মল খাওয়ার নামান্তর।

(ঘ) যে নিজের পক্ষ থেকে ওহী বানিয়ে বলে সে কুকুর, শুকর এবং বানর থেকেও নিকৃষ্ট।

(ঙ) কোনো একটি ব্যাপারে কেউ মিথ্যুক প্রমাণিত হলে অন্যান্য বিষয়েও তার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।

পাঠক, মির্যার পুরো জীবনটাই ছিলো– মিথ্যাকথা, মিথ্যা ভবিষ্যৎবাণী, গালিগালাজ, পাপাচার, কুরআন-হাদীসে বিকৃতি সাধন, আল্লাহ ও নবীদের শানে বেয়াদবী– ইত্যাদিতে ভরপুর। এ ধরনের একজন মানুষের জীবন কোনোভাবেই আলোচনাযোগ্য বিষয় নয়। কিন্তু নবুয়তের ইমারতে আঘাত হানার ধৃষ্টতা দেখানোর কারণে আজ তার জীবন নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ, মির্যার জীবনের সম্পূর্ণ আলোচনা সামনে চলে এলে তার অনুসারীদের সামনেও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী– মুজাদ্দিদ, মাসীহ, মাহদী ইত্যাদি হওয়া তো দূরের কথা, একজন ভালো মানুষের কাতারেও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আর নবী-রাসূল হওয়ার কথা তো কল্পনাও করা যায় না।

লেখক: শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

গ্রন্থ পরিচিতি

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. কৃত

আশরাফুল জওয়াব

মাওলানা আব্দুর রায্যাক যশোরী

ইসলাম জীবন-সমস্যার চিরন্তন সমাধান। কিন্তু সূচনালগ্ন থেকেই নব উদ্ভাবিত স্পষ্ট কিংবা প্রচ্ছন্ন শিরক-বিদআত, অনৈসলামিক রেওয়াজ-প্রথা, যুগ-চাহিদা-প্রসূত সংশয়-সন্দেহ প্রভৃতির অবাঞ্ছিত প্রবাহ ইসলামের শ্বাশত মূল্যবোধে আঘাত হানার উলঙ্গ প্রয়াস চালিয়ে আসছে। তবে প্রতিটি যুগে ইসলামী চিন্তানায়ক ও হক্কানী আলিমগণের সময়োপযুগী তীব্র প্রতিরোধের মুখে সে সব আঘাত মুখ থুবড়ে পড়েছে। উলামায়ে কেরাম যেমন বয়ান-বক্তৃতার মাধ্যমে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন তেমন ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে এগুলোর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। ফলে এ বিষয়ে রচিত হয়েছে বহু সমৃদ্ধ গ্রন্থ, أشرف الجواب (আশরাফুল জওয়াব) সেগুলোর অন্যতম।

লেখক: বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ এই গ্রন্থের লেখক হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.(১২৮০-১৩৬২হি.)। তিনি হাকীমুল উম্মত (উম্মতের চিকিৎসক) নামেই অধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন গত শতাব্দীর বিজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্ব। ইসলামের সকল শাখায় বিশেষত কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও তাসাওউফে তার পাণ্ডিত্য ছিল প্রবাদতুল্য। তিনি সহস্রাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম লিখেছেন, 'তাঁর মত এরকম সফল ও প্রভাব উদ্দীপক ইসলামী ব্যক্তিত্ব বিগত কয়েক শতাব্দীতেও দেখা যায় না।' (বিস্তারিত জানতে 'আশরাফচরিত' দ্রষ্টব্য)

বিষয়-বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্যাবলী:

'আশরাফুল জওয়াব' অর্থ শ্রেষ্ঠতম উত্তর। এগুলো মূলত তাঁর বিভিন্ন সময়ে কৃত ওয়াজ-নসীহত ও তাঁর নিকট পাঠানো প্রশ্নাবলীর জবাবের সমষ্টিবিশেষ। এগুলো পরবর্তীকালে 'আশরাফুল জওয়াব' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। এতে তিনি নানা রকম অনৈসলামিক রেওয়াজ-রসম, সামাজিক কুসংস্কার এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে উত্থাপিত সংশয়-সন্দেহের চুলচেরা বিশ্লেষণ করত ইসলামসম্মত ও বাস্তবধর্মী সমাধান নির্দেশ করেছেন। তাঁর এসব জবাব ও নির্দেশনা যুগ-জিজ্ঞাসার চাহিদা পূরণে পুরোপুরি সক্ষম ও সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক।

গ্রন্থটিকে ১ ভলিয়মে ৪ খণ্ডে বিন্যস্ত করা হয়েছে–

১ম খণ্ড: এতে অমুসলিম জাতির পক্ষ থেকে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও মুসলিম জাতির উপর যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তার প্রমাণসিদ্ধ জবাব স্থান পেয়েছে। যেমন:

প্রশ্ন: ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে?

প্রশ্ন: আল্লাহ তা'আলা কি কাফেরদেরকে ক্ষমা করতে সক্ষম নন?

প্রশ্ন: জিহ্বা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা কীভাবে কথা বলেন?

প্রশ্ন: শরীয়তের দৃষ্টিতে কুফরীর শাস্তি 'চিরস্থায়ী' জাহান্নাম কেন? অথচ অপরাধের সময় ও মাত্রা অনুপাতে শাস্তি হওয়া উচিৎ।

প্রশ্ন: মুসলমানগণ কি কাবা ঘরের পূজা করে থাকে?

প্রশ্ন: চুম্বনের মাধ্যমে মুসলমানগণ কি হাজরে আসওয়াদের ইবাদতে লিপ্ত হয়?

প্রশ্ন: বেহেশত ও দোযখ কি কেবল মুসলমানদের সান্ত্বনার বাণী এবং এগুলো কি অস্তিত্বহীন?

এই খণ্ডে এ ধরনের ২০টি গুরত্বপূর্ণ ও জটিল প্রশ্নের চমৎকার ও সন্তোষজনক জবাব দলীল-প্রমাণ ও যুক্তির আলোকে প্রদান করা হয়েছে।

২য় খণ্ড: এতে শিয়া, বিদআতী, গাইরে মুকাল্লিদ প্রভৃতি ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী এবং সর্বসাধারণের মূর্খতাপ্রসূত বিভিন্ন প্রশ্ন ও সংশয়-সন্দেহের সুবিন্যস্ত জবাব পৃথক পৃথক করে সংকলন করা হয়েছে। যেমন:

* অন্তিমকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়াত-কলম চাওয়ার প্রেক্ষিতে হযরত ওমর রাযি.-এর মন্তব্য– 'এর কী প্রয়োজন'-এর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা।

* হযরত আলী রা.-কেই খলীফা নির্বাচন করা উচিৎ ছিল– এই সন্দেহের অবসান।

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

* 'কোনো কোনো জ্ঞান সীনা-বা-সীনা চলে আসছে'– এই সন্দেহের অবসান।

* বিদআতের পরিচয় ও স্বরূপ।

*'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদার আসনে আসীন' শীর্ষক বানোয়াট হাদীসের স্বরূপ উদ্ঘাটন।

* কবরবাসীর নিকট সাহায্য কামনা করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

* উরসের সঠিক মর্ম, প্রচলিত উরস শরীয়তসম্মত নয়।

* দলীল চতুষ্টয়ের ভিত্তিতে ঈদে মিলাদুন্নবী উৎসব-এর অসারতা প্রমাণ এবং এর উদ্ভাবকদের দলীলের জবাব।

* কিয়াস ও ইজতিহাদ বাতিল সন্দেহের অবসান।

* মুকাল্লিদগণ হাদীসের পরিবর্তে ইমামগণের বক্তিগত মতের উপর আমল করে– এই অভিযোগের জবাব।

* দু'আ কবুল হলে তার ফল অবশ্যই পাওয়া যেতো। সুতরাং ফল যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন দু'আও কবুল হচ্ছে না– এ ধরনের সন্দেহের জবাব।

* পীর ধরার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত মাপকাঠি।

* হযরত মনসূর হাল্লাজ-এর 'আনাল হক' বলার তাৎপর্য।

এ ধরনের ১০০টি বিদআত, কুসংস্কার ও সংশয়-সন্দেহের সমাধান ও সমুচিত জবাব এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩য় খণ্ড : আধুনিক শিক্ষিত সমাজের ইসলাম ও ইসলামী বিষয়ে যেসব সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হয়, কুরআন-হাদীসের

আলোকে এবং যুক্তির নিরিখে তার জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন:
* আধুনিক শিক্ষিত সমাজের এ ধারণার অসরতা যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমগুলোই প্রকৃত ক্রিয়াশীল।
* শরীয়াতের বিধি-বিধানকে জাগতিক কল্যাণ ও উপকারের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত ভয়ানক পন্থা।
* আধুনিক শিক্ষিত সমাজের এ ধারণার অসারতা যে, ইসলামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের শিক্ষা বিদ্যমান।
* প্রতিটি বিষয়ের দলীল কুরআনে কারীম থেকে চাওয়া একটি মহাবিভ্রান্তি।
* মানুষের ভাগ্যে যখন লিখে দেয়া হয়েছে যে, সে অমুক গোনাহ করবে তাহলে মানুষ কেন অপরাধী হবে?
* আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে কেন কাফেরদেরকে দিয়েছেন?
এ খণ্ডে এমনই ৩২ টি কঠিন ও ভয়ংকর সন্দেহ সৃষ্টিকারী বিষয়ের বিস্ময়কর সমাধান প্রদত্ত হয়েছে।
৪র্থ খণ্ড: স্রষ্টার অস্তিত্ব, মানুষ সৃষ্টি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সশরীরে মেরাজ গমন, শহীদগণের জীবিত থাকা, কবরে আযাব ও সাওয়াব লাভ, পুলসিরাতের হাকীকত ইত্যাদি বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা। যেমন:
* ডারইউনের মতবাদ 'মানুষ বানর থেকে সৃষ্ট'-এর অসারতা।
* মৃত্যুর পর শাস্তি রুহের উপর হবে নাকি শরীরের উপর?
* মুসীবত যদি গোনাহের কারণে হয় তাহলে তো কাফেরদের উপর আসা উচিৎ।
* বিজাতিদের জাগতিক উন্নতি-অগ্রগতির রহস্য কী?
* দর্শন ও নবীদের শিক্ষার পার্থক্য।
* বিবেক-বুদ্ধি আমাদের এতোটা কল্যাণকামী নয় শরীয়ত যতোটা কল্যাণকামী।
* কুরআনে কারীম সংশ্লিষ্ট সংশয়-সন্দেহ দূর করার পদ্ধতি।
এই খণ্ডটি এ ধরনের মোট ৭৬টি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রশান্তিদায়ক বিস্তারিত সমাধান সম্বলিত ।
এছাড়াও গ্রন্থটি বিভিন্ন দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। তন্মধ্যে দলীল-প্রমাণের সুস্পষ্ট উত্থাপন, যুক্তির বলিষ্ঠ প্রয়োগ, বিষয়বস্তুর সাবলীল পর্যালোচনা এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষার সার্থক উপস্থাপনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
ভাষান্তর ও অনুবাদ:
গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত। উর্দুভাষীদের কাছে গ্রন্থটি ব্যাপক সমাদৃত। বর্তমান সামাজিক পরিবেশ ও আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এটিকে তাদের বৃহত্তর অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসে। অনুবাদ করেন মুহাম্মাদ আবূ আশরাফ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে লক্ষ-কোটি বাংলাভাষী মুসলমানের জ্ঞানের চাহিদা পূরণ করেছে এবং সন্দেহ ও যুগ-জিজ্ঞাসার ঘূর্ণিপাকে উদ্ভ্রান্ত মানুষকে পথের সন্ধান দিয়েছে।
এছাড়াও গ্রন্থটি মোহাম্মদী বুক হাউস থেকে আব্দুল খালেক দা.বা.-এর অনুবাদে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে।
প্রিয় পাঠক! গ্রন্থটির বিষয়, বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্যের এই হলো সামান্য ইঙ্গিত। আশাকরি এর দ্বারা অনুমিত হচ্ছে যে, গ্রন্থটি বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদের জন্য কতোটা প্রয়োজনীয় ও উপকারী। আমরা মনে করি, গ্রন্থটি আলিম, তালিবে ইলম ও সর্বসাধারণ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের পাঠ্য হওয়া উচিৎ।
আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে গ্রন্থটি বারবার পাঠ করে যাবতীয় সংশয়-সন্দেহ দূর করে, বিদআত-কুসংস্কার পরিহার করে এবং ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ছুঁড়ে ফেলে বিশুদ্ধ ঈমান-আকীদা নিয়ে কবরে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বে কারীম!

লেখক: শাইখুল হাদীস, আশরাফুল মাদারিস,
সতীঘাটা, যশোর।

দ্বি-মাসিক
রাবেতায়
লেখা পাঠানোর ঠিকানা
রাবেতা কার্যালয়
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
ই-মেইল : rabetaar@gmail.com
মোবাইল
০১৮২৬৬২১৬৬৯, ০১৯২৭৩২৪৬৪৭, ০১৯১২০৭৪৪৯৫

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

আসাদ হাফিজ
ঝিগাতলা, মুহাম্মদপুর

৪২০ প্রশ্ন: জনৈক ব্যক্তির কুরবানী দেওয়ার এবং হজ্জ করার নগদ অর্থ নেই। তবে তার প্রয়োজন অতিরিক্ত একটা ভিটা-বাড়ি আছে, যেটা বিক্রি করলে তার সম্পদ কুরবানীর নেসাব পরিমাণ হয়ে যায় এবং সে হজ্জ পালনেও সামর্থ্যবান হয়। কয়েক বছর যাবৎ সে জমিটি বিক্রি করার চেষ্টা করছে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা মিলছে না। জানার বিষয় হল, উল্লিখিত ভিটা-বাড়ির কারণে তার উপর কুরবানী ও হজ্জ ফরয হবে কিনা? ফরয হলে নগদ অর্থ না থাকায় সে তা কিভাবে আদায় করবে? আর কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে কুরবানী ও হজ্জ ফরয হয়?

উত্তর: কুরবানীর নেসাব হল স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত (৭.৫) ভরি, রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫) ভরি। আর অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার সমমূল্যের সম্পদ। হজ্জের নেসাব কুরবানীর নেসাবের মতোই। অর্থাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাব ছাড়া অবশিষ্ট সম্পদ যদি এ পরিমাণ হয়, যার দ্বারা বাইতুল্লাহ শরীফ যাতায়াত এবং উক্ত ব্যক্তি ফিরে আসা পর্যন্ত নিজ পরিবারের প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে এমন ব্যক্তির উপর উক্ত সম্পদ বিক্রি করে হজ্জ আদায় করা ফরয।

প্রশ্নোল্লিখিত সুরতে উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট নগদ অর্থ না থাকলে প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পত্তি তথা ভিটা-বাড়ি বিক্রি করে হজ্জ, কুরবানী করতে হবে। অবশ্য বিক্রি করে টাকা হস্তগত হওয়া পর্যন্ত তার উপর কুরবানী বা হজ্জ ফরয হবে না।

উল্লেখ্য, উক্ত ভিটা-বাড়ি বিক্রি করার জন্য লোক লাগিয়ে রাখতে হবে এবং তা বিক্রি করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আর স্বাভাবিক বাজারমূল্যের ক্রেতা পাওয়া গেলেই তা বিক্রি করে দিতে হবে। (মুলতাক্বাল আবহুর ৩৩৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯২, ১/২১৮ ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪০৫, আল-মুহীতুল বুরহানী ২/৪১৭, গুনিয়াতুন নাসিখ ফী আহকামিল মানাসিক ৭, ইমদাদুল আহকাম ২/১২৭)

যুবায়ের হাসান
লালমাটিয়া

৪২১ প্রশ্ন: আমাদের মরহুম পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি এখনও বণ্টন করা হয়নি। আমরা সকল ওয়ারিস তা যৌথভাবে ভোগ করে থাকি। প্রশ্ন হলো, অবণ্টিত এই সম্পত্তির কারণে আমাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর: আপনাদের পৈত্রিক সম্পত্তি যদি এ পরিমাণ হয় যে, তা বণ্টন করলে প্রত্যেক ওয়ারিস নেসাব পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যায় এবং তা নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় তাহলে প্রত্যেক ওয়ারিসের উপরই কুরবানী করা ওয়াজিব (যদিও ফিলহাল সম্পত্তি বণ্টন করা না হয়)। অনুরূপভাবে পৈত্রিক সম্পত্তি বণ্টন করলে ওয়ারিসগণ নেসাব পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী হয় না বটে, তবে এর সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত টাকা-পয়সা ও সম্পদ যোগ করলে তা নেসাব পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে এই সূরতে যে ওয়ারিসের সম্পদ নেসাব পরিমাণ হয়ে যাবে শুধু তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে, অন্যদের উপর ওয়াজিব হবে না।

উল্লেখ্য, মৌরুসী সম্পত্তি অবণ্টিত রেখে দেয়া উচিত নয়। কাজেই আপনাদের পৈত্রিক সম্পত্তি ফারায়েয তথা মৌরুসী সম্পত্তি বণ্টনের ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী বণ্টন করে যার যার অংশ বুঝিয়ে দেয়া জরুরী। প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ বুঝে পাওয়ার পর যদি কেউ কারো সঙ্গে যৌথ থাকতে চায় তাহলে তার জন্য সেই সুযোগও রয়েছে। (হিদায়া ৪/৩৫৫, তুহফাতুল ফুকাহা ৩/৮১, তাবয়ীনুল হাকায়িক ৩/৩১৩, ইনায়া ৬/৪৪০)

শিহাবুদ্দীন আহমদ ফরহাদ
নারায়ণগঞ্জ

৪২২ প্রশ্ন: কোন এক পরিবারে পিতার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। তার কয়েকজন বালেগ সন্তানও আছে। সন্তানগণ প্রত্যেকে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ায় তাদের উপরও কুরবানী করা ওয়াজিব। এখন পিতা যদি পশু ক্রয় করে সন্তানদের অনুমতি না নিয়েই তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করে দেয় তাহলে এর দ্বারা কি সন্তানদের ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে যাবে, নাকি সন্তানদের প্রত্যেকের কাছ থেকেও অনুমতি নেওয়া জরুরী?

উত্তর: অন্যের পক্ষ হতে ওয়াজিব কুরবানী করার ক্ষেত্রে পূর্বেই তার অনুমতি নেওয়া চাই। অনুমতিবিহীন কেউ কারো পক্ষ হতে কুরবানী করলে যার পক্ষ হতে কুরবানী করা হলো তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে না। তবে কেউ যদি তার কোন আপনজনের পক্ষ হতে তাদের অনুমতিক্রমে নিয়মিত কুরবানী করতে থাকে তাহলে নিয়মিত করার এই রেওয়াজ ও প্রথাকে অনুমতি ধরে নেওয়ার ব্যাপারেও ফিকাহবিদগণের অভিমত রয়েছে। কাজেই প্রশ্নোল্লিখিত সুরতে পিতা যদি তার সন্তানদের পক্ষ থেকে অতীত বছরগুলোতে নিয়মিত কুরবানী আদায় করে থাকে তাহলে উল্লিখিত ফিকাহবিদগণের অভিমতের ভিত্তিতে আলোচ্য (অনুমতিবিহীন) কুরবানীটি সহীহ গণ্য করার অবকাশ আছে। কিন্তু ভবিষ্যতে সতর্কতামূলক প্রতি বছর কুরবানীর পূর্বেই সন্তানদের কাছ থেকে মৌখিক অনুমতি নিয়ে নেওয়া চাই। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০২, ফাতাওয়া বায্‌যাযিয়া ৬/২৯৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/২৪৫, বাদায়িউস সানায়ে ৪/২১১, ফাতাওয়া শামী ৬/৩১৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৬১০, আযীযুল ফাতাওয়া ৭২২)

যাইনুল আবেদীন
লালমনিরহাট

৪২৩ প্রশ্ন: যার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব সে যদি নিজের পক্ষ হতে

কুরবানী না করে অন্য কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করে তাহলে তার নিজস্ব ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে, নাকি নিজের কুরবানী পৃথকভাবে করতে হবে?

উত্তর: যার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব সে ব্যক্তি নিজের নামে কুরবানী না করে অন্য কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির নামে নফল কুরবানী করলে কুরবানীদাতার নিজের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে কুরবানীর সওয়াব যার নামে করা হয়েছে সে পাবে। এজন্য ওয়াজিব কুরবানী নিজের নামেই করা চাই। তবে যদি নিজের উপর ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও নিজ খরচে অন্যের পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়ে অন্যের ওয়াজিব কুরবানী করে দেয়, যেমন কোন ছেলে নিজে ধনী হওয়া সত্ত্বেও পিতার আদেশে পিতার ওয়াজিব কুরবানী করে দেয় এক্ষেত্রে পিতার ওয়াজিব কুরবানী তো আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু ছেলের দায়িত্ব হতে তার নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে না। বরং তাকে তার নিজ কুরবানীও করতে হবে। আর কুরবানীর দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে সে পরিমাণ মূল্য সদকা করে দিতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৬, আল-বাহরুর রায়েক ৮/৩২৮, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২০)

মাহমুদুল হাসান
নোয়াখালী

৪২৪ প্রশ্ন: (ক) এক ব্যক্তির যিম্মায় কয়েক বছরের কুরবানী ওয়াজিব ছিল। উক্ত ব্যক্তি কুরবানী অনাদায়ী অবস্থায় অসিয়ত না করেই মারা গেছে। এখন তার ছেলেরা যদি নিজেদের কুরবানীর পশুর মধ্যে অংশ হিসেবে পিতার অনাদায়ী রয়ে যাওয়া সবগুলো কুরবানী একসাথে আদায় করে দেয় তাহলে তা আদায় হবে কি না?

(খ) ঐ কুরবানীর গোশতের হুকুম কি সাধারণ কুরবানীর গোশতের মতো, নাকি সমস্ত গোশত সদকা করে দিতে হবে?

উত্তর: (ক) মৃত ব্যক্তি যেহেতু অসিয়ত না করেই ইন্তেকাল করেছে সেহেতু তার ওয়ারিসদের যিম্মায় তার পক্ষ থেকে কুরবানী করা জরুরী নয় এবং তারা যদি মৃত ব্যক্তির অনাদায়ী ওয়াজিব কুরবানী আদায়ের উদ্দেশ্যে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করে তাহলে সেই কুরবানী দ্বারা মৃত ব্যক্তির অনাদায়ী ওয়াজিব আদায় হবে না। বরং এই কুরবানী নফল গণ্য হবে এবং মৃত ব্যক্তি এর সাওয়াব লাভ করবে।

(খ) যেহেতু এই কুরবানী নফল গণ্য হচ্ছে সেহেতু এই কুরবানীর গোশতের হুকুম সাধারণ কুরবানীর গোশতের মতোই। অর্থাৎ কুরবানীদাতারা নিজেরাও খেতে পারবে এবং আত্মীয়-স্বজনদেরকেও হাদিয়া দিতে পারবে; সদকা করা জরুরী নয়। (ফাতাওয়া শামী ৪/৪৮২, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৩/২৯৫, ইমদাদুল আহকাম ৪/২৩৩-২৩৬ ; ইমদাদুল ফাতাওয়া ৭/৪৯৬)

আবদুস সালাম
ধানমন্ডি, ঢাকা

৪২৫ প্রশ্ন: জনৈক ব্যক্তি ঘুষ দিয়ে সরকারী চাকুরী নিয়েছে। তার চাল-চলন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে তার ইনকাম হালাল হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ হয়। অতীতে তার হারাম পন্থায় উপার্জনের প্রমাণও রয়েছে। বর্তমানে সে এবং তার পরিবারের কেউ দীনের উপর নেই। এমন লোকের সঙ্গে দীনদার ব্যক্তির শরীকানা কুরবানী দেয়ার জায়িয আছে কি?

উত্তর: প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত চাকুরীজীবি যদি তার বেতনের টাকার সাথে হারাম টাকা মিশ্রিত না করে, অথবা তার অন্য কোন হালাল উপার্জন থাকে এবং সে উক্ত বেতনের টাকা বা হালাল উপার্জনের টাকা দিয়ে কুরবানীতে শরীক হয় তাহলে দীনদার ব্যক্তির জন্য তার সঙ্গে শরীক হয়ে কুরবানী করতে কোন সমস্যা নেই। আর যদি উক্ত বেতনের সঙ্গে হারাম মাল এমনভাবে মিশ্রিত থাকে যে, সেটাকে পার্থক্য করা যায় না, বা হালালের তুলনায় হারাম মাল বেশি থাকে তাহলে তার সঙ্গে শরীক হয়ে কুরবানী করলে দুইজনের কারও কুরবানী সহীহ হবে না। (সূরা নিসা-২৯, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ৯২৪৫, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৯৮৯, ২৭৯৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫১, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৬)

হাসান মাহমূদ
মাগুরা

৪২৬ প্রশ্ন: জনৈক প্রবাসী কুরবানী করার জন্য বাংলাদেশে অবস্থানকারী একব্যক্তির নিকট ১০,০০০ হাজার টাকা পাঠায় এবং বলে দেয় যে, দশ হাজার টাকার মধ্যে একটি খাসী ছাগল কুরবানী করবে এবং কুরবানীর গোশত নিজেরাই খেয়ে নিবে। বাংলাদেশী লোকটি যেহেতু গোশত খাবে এজন্য নিজের পক্ষ থেকে আরও ৫০০ টাকা সংযুক্ত করে মোট ১০,৫০০ টাকা দিয়ে একটি ভালো মানের খাসী ক্রয় করে প্রবাসী ব্যক্তির নামে কুরবানী করে দেয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশী ব্যক্তিটি অতিরিক্ত ৫০০ টাকা শুধু ভালো গোশত খাওয়ার নিয়তে সংযুক্ত করেছিল এবং একথা সে প্রবাসী ব্যক্তিকে জানায়নি আর তার থেকে এই টাকা ফেরৎও নেয়নি। জানার বিষয় হল, এভাবে কুরবানী করার দ্বারা প্রবাসী ব্যক্তির কুরবানী আদায় হয়ে গিয়েছে, নাকি এক ছাগলে দুই ব্যক্তি শরীক হওয়ার কারণে কুরবানীই সহীহ হয়নি? অনুরূপভাবে বাংলাদেশী কর্তৃক ৫০০ টাকা ভর্তুকি দেওয়া এবং গোশত খাওয়ার নিয়তে দায়িত্ব পালন করার বিধান কী?

উত্তর: শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব কুরবানী সহীহ হওয়ার শর্ত হলো, কুরবানীকারী কুরবানীর জন্য নির্ধারিত বড় পশুর পূর্ণাঙ্গ কিংবা তার সপ্তমাংশের মালিক হওয়া অথবা কাউকে তার পক্ষ হতে বড় পশুর পূর্ণাঙ্গ বা সপ্তমাংশ কুরবানী করে দেওয়ার আদেশ দেওয়া। আর ছোট পশুর ক্ষেত্রে পূর্ণ পশুর মালিক হওয়া অথবা কাউকে পূর্ণ ছোট পশু কুরবানী করে দেয়ার আদেশ দেওয়া।

প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে যেহেতু বাংলাদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তির ক্রয়কৃত ছাগলের মধ্যে নিজের পক্ষ হতে ৫০০ টাকা সংযোজন করায় ছাগলের ৫০০ টাকার আনুপাতিক অংশে প্রবাসীর মালিকানা কিংবা আদেশ কোনটিই পাওয়া যায়নি এ কারণে এর দ্বারা প্রবাসীর ওয়াজিব কুরবানী আদায় হয়নি। অবশ্য বাংলাদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তি যেহেতু নিজের পক্ষ থেকে ৫০০ টাকা সংযুক্ত করেও প্রবাসীর নামেই কুরবানী করেছে সেহেতু এর দ্বারা প্রবাসীর পক্ষ থেকে

নফল কুরবানী আদায় হয়ে গেছে। আর যেহেতু বাংলাদেশী ব্যক্তির দায়িত্বহীনতার কারণে ওয়াজিব কুরবানী নষ্ট হয়েছে এজন্য বাংলাদেশী ব্যক্তি প্রবাসীর ওয়াজিব কুরবানী আদায় করার লক্ষ্যে ১০,০০০ হাজার টাকা গরীব-মিসকীনদের সদকা করে দিবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/২৮৮, ৫/৩০২, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৩)

উবায়দুল্লাহ
উত্তরা, ঢাকা

৪২৭ প্রশ্ন: আমি দেশের বাইরে এমন জায়গায় থাকি যেখানে কুরবানী করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। উদাহরণত ১৫০ মাইল দূরে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে কুরবানী দিতে হয়। উপরন্তু প্রশাসনের অনুমতি ব্যতীত কুরবানী করা সম্ভব নয়। আর প্রশাসনের অনুমতি পাওয়াও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এসব সমস্যার কারণে এবং কর্মক্ষেত্র থেকে ছুটি মঞ্জুর না হওয়ায় একইদিনে ৩০০ মাইল যাতায়াত করা এবং কুরবানীর কাজে যথেষ্ট সময় লাগার কারণে একইদিনে ঈদ ও কুরবানী করা প্রায়-অসম্ভব হয়ে পড়ে। উক্ত সমস্যার কারণে অনেকের তো কুরবানী দেয়াই সম্ভব হয় না। এখন আমি যদি প্রবাসে কুরবানী না করে আমার পক্ষ হতে কুরবানী করার জন্য দেশে থাকা পরিবারকে কুরবানীর টাকা পাঠিয়ে দেই এবং তারা আমার পক্ষ হতে কুরবানী করে দেয় এতে কি আমার কুরবানী আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর: প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে আপনার কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। যদিও নিজ হাতে কুরবানী করা বা নিজে জবাই দেখা এবং নিজের কুরবানীর গোশত খাওয়ার ফযীলত পাওয়া যাবে না। উল্লেখ্য, আপনার পরিবার দেশের যে স্থানে আপনার পক্ষ থেকে কুরবানী করবে তাদেরকে সেখানকার ঈদুল আযহার নামায শেষ হওয়ার পর কুরবানী করতে হবে। এক্ষেত্রে আপনি বিদেশে ঈদের নামায পড়ার আগেই যদি দেশে আপনার কুরবানী হয়ে যায় এতে কোন অসুবিধা হবে না। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪২, আদ-দুররুল মুখতার ৬/৩১৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৪০০)

ইশফাক আহমদ
বসিলা, মুহাম্মদপুর

৪২৮ প্রশ্ন: চৌদ্দজন ব্যক্তি যাদের প্রত্যেকের উপর কুরবানী ওয়াজিব, অথবা চৌদ্দ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবার যাদের রান্না একই সঙ্গে হয়– যদি কুরবানী দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমপরিমাণ টাকার অংশীদারিত্বে চৌদ্দটি ভাগের জন্য দু'টি গরু ক্রয় করে এবং কোন্ গরুতে কোন্ সাতজন অংশীদার তা নির্দিষ্ট না করেই জবাই করা হয় এবং জবাইয়ের পর গরু দুটির গোস্ত সম্পূর্ণ মিলিয়ে সমান চৌদ্দ ভাগে বণ্টন করে নেয় তাহলে এভাবে কুরবানী করা কি বৈধ হবে? না হলে এক্ষেত্রে বৈধ পদ্ধতি কী?

উত্তর: শরীয়তমতে গরু, মহিষ ও উট ইত্যাদির কুরবানীতে যেমন সাতভাগের বেশি করা জায়েয নেই, তেমনই সাত-এর অধিক ব্যক্তি অংশীদার হয়েও কুরবানী করা জায়েয নেই। যদি কেউ এরূপ করে তাহলে কোন অংশীদারের কুরবানীই সহীহ হবে না। প্রশ্নের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, আলোচ্য কুরবানীতে দুই গরুর কোনটিতেই নির্দিষ্ট সাত ব্যক্তির অংশীদারিত্ব পাওয়া যায়নি বরং চৌদ্দজনের প্রত্যেকেই উভয় গরুতে অংশীদার হয়েছে। এমতাবস্থায় কুরবানী সহীহ হবে কিনা এ ব্যাপারে নীতিগত বিরোধ রয়েছে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কারও কুরবানীই সহীহ হবে না। আর বিশেষ নীতির আলোকে সহীহ হওয়ার আশা করা যায়। সুতরাং ভবিষ্যতে এ ধরণের অসতর্ক কাজ করবে না।

এক্ষেত্রে বৈধ ও নিরাপদ পদ্ধতি হলো, প্রত্যেক শরীকের অংশ কোন্ গরুতে আছে জবাই করার পূর্বেই সেটা নির্দিষ্ট করে নিবে। অতঃপর প্রত্যেক শরীক যে গরুতে অংশীদার হবে ঐ গরুর পূর্ণমূল্যের এক-সপ্তমাংশ মূল্য পরিশোধ করবে; দুই গরুর সামষ্টিক মূল্যকে চৌদ্দভাগে ভাগ করে সকলে সমহারে পরিশোধ করবে না। কারণ, দু'টি গরু সব দিক দিয়ে পুরাপুরি একরকম হওয়া সম্ভব নয়। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৩১৮, ফাতাওয়া শামী ৬/৩১৬, ইমদাদুল আহকাম /২৭৩)

কাজী আবূ সাঈদ
শেখেরটেক, ঢাকা।

৪২৯ প্রশ্ন: আমাদের এলাকার এক খতীব সাহেব বয়ানে বলেছেন, কুরবানীর পশুতে আকীকা দেয়া জায়েয নেই। জনৈক মুসল্লী প্রশ্ন করলেন, মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী দেয়া যাবে কি? তিনি উত্তর দিলেন– এ ব্যাপারে জায়েয না-জায়েয উভয় বক্তব্যই পাওয়া যায়, এটা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ আছে। তবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করা জায়েয না-হওয়ারই কথা, কারণ সে-তো মারা গেছে। তারপর আরেক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হুযূর! মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করার নিয়ম কি কুরআনে আছে? খতীব সাহেব বললেন, না, কুরআনে নেই। একথা শুনে আরেক ব্যক্তি মন্তব্য করলো, এটা তাহলে মৌলভীদের বানানো মাসআলা। এখন জানার বিষয় হল, আমার দাদা-পিতা সকলে এবং আমিও অধিকাংশ সন্তানের আকীকা কুরবানীর সাথেই দিয়েছি। তাহলে কি আমাদের কৃত সেই আকীকাগুলো সহীহ হয়নি? অনুরূপভাবে আমরা একই পশুতে নিজেদের কুরবানীর সঙ্গে পিতা-মাতা ও মরহুম আত্মীয়-স্বজনের নামেও কুরবানী দিয়ে থাকি, এটাও কি কবুল হবে না?

উত্তর: উক্ত খতীব সাহেব কর্তৃক বর্ণিত মাসআলাগুলো ঠিক নয়; বরং কুরবানী ও আকীকা একসঙ্গে দেয়া জায়েয এবং মৃত ব্যক্তির নামেও কুরবানী দেয়া জায়েয। তাই আপনি কুরবানীর সঙ্গে নিজ সন্তানের আকীকা দিয়ে এবং কুরবানীর সময় মৃত আত্মীয়-স্বজনের নামে কুরবানী করে কোনও ভুল করেননি। কারণ মানুষ মারা গেলে যদিও দুনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তথাপি সে সাওয়াবের মুখাপেক্ষী থাকে এবং নফল ইবাদত ও দান-সদকার মাধ্যমে তাকে সওয়াব পাঠানোর সুযোগও থাকে। আর নফল কুরবানী তেমনই সওয়াব পাঠানোর একটি মাধ্যম। (সহীহ মুসলিম ১/১২, আল-মাবসূত লিস-সারাখাসী ১২/১২, কাশফুল আসরার ১/১৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫১, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/২৫২, ১৭/২৫০, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৫/৬০৯, ১৫/৫০০)

মুহিবুর রহমান
ঢাকা

৪৩০ প্রশ্ন: জনৈক ব্যক্তি মক্কা শরীফে

যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে হজ্জের কুরবানী ছাড়া ভিন্নভাবে কুরবানী দিতে চাচ্ছে। সেইসাথে তার বাংলাদেশে থাকা একভাইয়ের পক্ষ থেকেও মক্কা শরীফে কুরবানী করতে চাচ্ছে। কিন্তু মক্কা শরীফে যখন যিলহজ্জের দশ তারিখ, সাধারণত বাংলাদেশে তখন নয় তারিখ হয়। জানার বিষয় হল, মক্কা শরীফে সেখানকার দশ তারিখে বাংলাদেশে অবস্থানকারী ভাইয়ের পক্ষ থেকে ওয়াজিব বা নফল কুরবানী আদায় হবে কিনা?

উত্তর: কুরবানী তারিখ ও সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পশুটি যে জায়গায় জবাই করা হয় সে জায়গার তারিখ ও সময় ধর্তব্য হয়। যার পক্ষ থেকে কুরবানী করা হয় তার অবস্থানস্থলের তারিখ ও সময় ধর্তব্য হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে হজ্জ করার জন্য যে ভাই মক্কায় অবস্থান করছেন সে ভাই তার বাংলাদেশে থাকা ভাইয়ের পক্ষ থেকে ওয়াজিব বা নফল কুরবানী করতে পারবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের তারিখ ধর্তব্য নয়। তবে নিজ হাতে জবাই করা বা জবাই দেখা এবং কুরবানীর গোশত খাওয়া ইত্যাদি মুস্তাহাব আমল থেকে বঞ্চিত হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৬, মাজমাউল আনহুর ৪/১৭, ফাতাওয়া শামী ৯/৫২৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫/১২৮)

মাকসুদুর রহমান
ফেনী

৪৩১ প্রশ্ন: কুরবানীর পশু ক্রয় করার জন্য দুই ব্যক্তির টাকা একত্র করে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট পাঠানো হলো। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি সেই টাকা দ্বারা উভয়ের জন্য একত্রে দু'টি খাসি ক্রয় করল। কিন্তু খাসি দু'টির কোন্‌টি কার জন্য এবং কোন্‌টির মূল্য কতো তা নির্দিষ্ট করল না। অতঃপর এক-একটি খাসী এক-একজনের পক্ষ হতে কুরবানী করা হলো। এমতাবস্থায় এই কুরবানী বিশুদ্ধ হবে কি?

উত্তর: বর্ণনা অনুযায়ী দুজনের পৃথক পৃথক টাকা একত্র করে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা অতঃপর উভয়ের জন্য একত্রে দুটি খাসী ক্রয় করার পর কোন্‌টি কার জন্য তা নির্দিষ্ট না করেই দু'জনের নামে দু'টি খাসী কুরবানী দেওয়াতে সমস্যা নেই; কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হল, প্রত্যেকের টাকা দ্বারা তার জন্য পশু ক্রয় করা এবং মূল্য কমবেশী হয়ে থাকলে নির্দিষ্ট আদেশকারীর সাথে লেনদেন পরিষ্কার করে নেওয়া। (হিদায়া ৩/১৭৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০৬, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৭, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৪/৩০৪)

বোরহানুদ্দীন
যাত্রাবাড়ী

৪৩২ প্রশ্ন: একব্যক্তি তার একটি গাভী আরেকজনের কাছে বন্ধক রেখেছিল। গাভীটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন গাভীর মালিক মান্নত করে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি গাভীটিকে সুস্থ করে দেন তাহলে এ বছর সেটিকে কুরবানী করে দিবে। এদিকে মালিকের অজান্তে গাভীটি গর্ভবতী হওয়ার ফলে মালিক সেটিকে সে বছর কুরবানী করতে পারেনি। অতঃপর গাভীটি বাচ্চা প্রসব করার পর পরবর্তী বছর মালিক সেটিকে কুরবানী করে দেয়। প্রশ্ন হলো, এক বছর বিলম্ব করে পরবর্তী বছর কুরবানী করার দ্বারা কি মান্নত আদায় হয়েছে? আর এই গাভীর গোশত তার মালিকের জন্য হালাল হবে নাকি সদকা করে দিতে হবে? সেইসঙ্গে মান্নতের কুরবানীর গোশতের বিধান জানিয়ে দিলে উপকৃত হবো।

উত্তর: গর্ভবতী হওয়ার পরও সেই বছরেই এ পশুটি কুরবানী করে দেওয়া জরুরী ছিল। গর্ভের কারণে বিলম্ব করা জায়িয হয়নি। সেক্ষেত্রে জবাইয়ের পর তার পেটে জীবিত বাচ্চা পাওয়া গেলে বাচ্চাটিকেও জবাই করতে হতো। তা না করে এক বছর বিলম্ব করা জায়িয হয়নি। আর যখন নির্দিষ্ট বছর কুরবানী করা হলো না, তখন উচিত ছিল গর্ভ কিংবা বাচ্চাসহ সেটিকে জীবিত সদকা করে দেওয়া। তা না করে জবাই করা ঠিক কাজ হয়নি। উভয় ভুলের জন্য এই ব্যক্তির তাওবা করা জরুরী। নির্দিষ্ট বছর করুক বা পরে করুক সর্বাবস্থায় এই গোশত সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। সদকা না করে মালিক নিজে খেয়ে ফেললে তার মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। আর বাচ্চাটি বর্তমানে জীবিত থাকলে সেটাও জীবিত সদকা করে দিতে হবে। (সূরা হজ্জ-২৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৮, আদ-দুররুল মুখতার ৬/৩২২, বাদায়িউস সানায়ে ৬/২৯৩, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৫৬-৩৫৭)

যদি কেউ পশু কুরবানীর মান্নত করে তাহলে সেই মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং সেই পশুর গোশত খাওয়া তার জন্য নাজায়িয; বরং সম্পূর্ণ গোশত সদকা করে দিবে। যদি সেই পশুর গোশত মালিক নিজেরাই খেয়ে ফেলে তাহলে তার সমপরিমাণ মূল্য সদকা করে দিতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩২১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৬, বাদায়িউস সানায়ে ৬/২৯৪)

আকরাম হোসাইন
শরীয়তপুর

৪৩৩ প্রশ্ন: যদি কুরবানীর জন্য কোন পশু ক্রয় করা হয় এবং জবাইয়ের আগে পশুটির গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পায় তাহলে এই পশুর মাধ্যমে কুরবানী জায়েয আছে কি? বিশেষত শরীকানা কুরবানীর ক্ষেত্রে এই পশুর বিধান কী হবে?

উত্তর: প্রশ্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে কুরবানীদাতা/কুরবানীদাতাগণ যদি ধনী হয় তাহলে তারা এই গর্ভবতী পশু কুরবানী না করতে চাইলে অন্য একটি পশু কিনে নিবে। আর যদি কুরবানীদাতা বা অংশীদার গরীব হয় তাহলে এই গর্ভবতী পশু দ্বারা কুরবানী আদায় না করার কোন উপায় না থাকায় এই পশু দ্বারাই কুরবানী করবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৮৭, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২১, ইমদাদুল ফাতাওয়া জাদীদ ৮/২৬২-৬৩, কিফায়াতুল মুফতী ৮/১৯০)

আবু বকর সিদ্দীক
কুষ্টিয়া

৪৩৪ প্রশ্ন: আমরা জানি, শরীকানা কুরবানী দিলে কুরবানী করার পর সম্পূর্ণ গোশত ওজন করে সমানভাবে শরীকদের মাঝে বণ্টন করতে হয় পরে শরীকরা নিজের অংশকে তিনভাগ করতেও পারে বা পুরোটা নিজেও রেখে দিতে পারে। তবে শরীকানা বণ্টনের পূর্বে কেউ কোন অংশ কাউকে দিতে পারবে না। কিন্তু আমাদের এলাকায় ধনী-গরীব নির্বিশেষে– কারও উপর কুরবানী

ওয়াজিব হোক বা না হোক– সব ধরনের ব্যক্তিকে নিয়ে 'সমাজ' পদ্ধতি বিদ্যমান। এই 'সমাজ' ব্যবস্থার ভিত্তিতে যারা কুরবানী করে তারা কুরবানী করার পর প্রথমে পূর্ণ অংশকে তিনভাগ করে একভাগ সমাজের নামে সমাজপ্রধানের নিকট দিয়ে দেয়। আর সমাজের নেতৃবৃন্দ এই এককভাগগুলোকে জমা করে সমাজে যতোটি পরিবার আছে (চাই তারা কুরবানী করুক বা না করুক) ততোগুলো ভাগ করে সবাইকে একভাগ করে প্রদান করে। আবার কেউ তার মান্নত-কুরবানীর গোশত সমাজকে দিচ্ছে কিনা তা জানা নেই এবং জানা সম্ভবও হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, যারা কুরবানী করে তারা সমাজকে একভাগ দেওয়ার সময় সদকা বা দান কোনটারই নিয়্যত করে দেয় না বরং সমাজকে দেয় যেন সবাই কিছু কিছু পেয়ে যায় এবং সবাই ঈদ-আনন্দ উপভোগ করতে পারে। জানার বিষয় হল,

এক. এভাবে শরীকানা বণ্টনের পূর্বে সমাজকে একভাগ দিয়ে দেওয়া জায়িয হবে কিনা ?

দুই. যেহেতু আমিও সমাজের একজন সদস্য এবং আমার কুরবানীর একটা অংশও সমাজকে দিয়েছিলাম, অতঃপর সমাজ তা থেকে একভাগ আমাকে দিয়েছে। এখন আমার তা নেওয়া জায়িয হয়েছে কিনা?

তিন. যার উপর কুরবানী ওয়াজিব এমন ব্যক্তির মান্নতের কুরবানী করার দ্বারা ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে কিনা? ওয়াজিব কুরবানী কি আলাদাভাবে করতে হবে?

উত্তর: (এক ও দুই)

(ক) কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ গরীবদেরকে দেওয়া মুস্তাহাব এবং এটা সম্পূর্ণ কুরবানীদাতার ব্যক্তিগত বিষয়। কুরবানীদাতা কতোটুকু সদকা করবে কিংবা আদৌ করবে কিনা এ ব্যাপারে অন্যদের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। হ্যাঁ, স্বাধীনভাবে যার যতোটুকু ইচ্ছা এক জায়গায় একত্র করে শুধু গরীবদের মাঝে বণ্টনের ব্যবস্থা করলে তাতে কোন অসুবিধা নেই; চাই তা শরীকদের পরস্পরে বণ্টনের পরে হোক কিংবা সকলের সম্মতিক্রমে বণ্টনের পূর্বে হোক।

(খ) শরীয়ত কাউকে সামাজে গোশত দান করতে বাধ্য করেনি; বরং ব্যক্তিগতভাবে দান করতে উৎসাহ দিয়েছে। সমাজের জন্য এক তৃতীয়াংশ কিংবা গরীব-ধনী সকলের মাঝে বণ্টনের জন্য এক তৃতীয়াংশ এ ধরনের কোন নিয়ম শরীয়তে নাই। এটা একটা গলদ পন্থা, যা একাধিক কারণে শরীয়ত পরিপন্থী। যথা–

ক. এ ব্যবস্থাপনায় সকলে খুশি মনে অংশ গ্রহণ করে এটা নিশ্চিত নয়। কেউ সামাজিক নিয়মে অংশগ্রহণ করে এমনও আশঙ্কাও থাকে। সেক্ষেত্রে ধনীদের জন্য ঐ ব্যক্তির প্রদত্ত গোশত হালাল হবে না।

খ. এমনও কেউ থাকতে পারে, যে তার দানকৃত অংশ শুধু গরীবদেরকে দিতে চায়; ধনীদেরকে নয়। প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে এই সুযোগ বিনষ্ট করা হয়।

গ. প্রদত্ত গোশতসমূহে কারো মান্নতের অংশও থাকতে পারে যা শুধু গরীবদের মাঝেই বণ্টন করতে হয়। প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতি চালু থাকলে ঐ ব্যক্তির জন্য এখানে শরীক হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

সুতরাং এই গলদ পন্থার কারণে সমাজ থেকে দানকৃত গোশত আপনার জন্য গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কেননা অনির্দিষ্টভাবে এক তৃতীয়াংশ সমাজকে দান করায় তা গরীবদের জন্য দানযোগ্য তৃতীয়াংশ গণ্য হবে। এখন আপনার করণীয় হল, প্রাপ্ত সেই একভাগ পরিমাণ গোশতের আনুমানিক মূল্য কোন গরীবকে দান করে দেয়া। (আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী; হাদীস ১১৫২৬, বাদায়িউস সানায়ে ৪/২২৪, আল-বাহরুর রায়েক ৮/৩২১-৩২৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৯১-৯২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৫৪৯)

তিন. যে ব্যক্তির উপর পূর্ব থেকেই কুরবানী ওয়াজিব তার মান্নতের কুরবানীর দ্বারা তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে না। ওয়াজিব কুরবানী পৃথকভাবে করতে হবে। (বাদায়িউস সানায়ে ৪/১৯৪-৯৫, আল-বাহরুর রায়েক ৮/৩২১, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৩২-৩৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৫২)

জাহিদ হাসান
নোয়াখালী

৪৩৫ প্রশ্ন: কুরবানীর দিন কুরবানীর পশু জবাই করার জন্য সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত একটি স্থানে সমাজের সমস্ত পশু জবাই করা হয়। গোশত প্রস্তুত করার পর প্রত্যেক কুরবানীদাতা তার গরু এবং মহিষের গোশত তিন ভাগের দুই ভাগ এবং ছাগল ও ভেড়ার অর্ধেক সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে জমা দিয়ে যায়। তবে পশুর মাথা এবং পায়ের কিছু অংশ কুরবানীদাতা নিয়ে যায়। অতঃপর সমাজপতিরা জমাকৃত গোশত সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে জনপ্রতিহারে সমানভাবে বণ্টন করে দেয়। এক্ষেত্রে ধনী-গরীব, কুরবানীদাতা এবং ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যারা কুরবানী করেনি তাদের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয় না। উল্লেখ্য, এখানে মান্নতের কুরবানীর গোশত, আকীকার পশুর গোশত এবং সন্দেহজনক হারাম উপার্জনে ক্রয়কৃত পশুর গোশত স-ব একত্র করা হয়। গোশত বণ্টনের পুরো কাজ আঞ্জাম দেন সমাজপতিরা; কুরবানীদাতারা গোশত জমা দিয়েই দায়মুক্ত হয়ে যায়।

উল্লিখিত সকল বিষয়ে সমাজের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে বাধ্য না করা হলেও প্রচ্ছন্নভাবে বাধ্য করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্নজন বিভিন্ন ধরনের আবেগপূর্ণ কথা বলে থাকেন। বিষয়টির পক্ষে সমাজপতিদের বক্তব্য হলো, 'আমাদের তো সমাজ নিয়ে চলতে হয়। সমাজের দেখাশোনার দায়িত্ব আমাদেরই বহন করতে হয়। আমরা অন্যায় কাজ করছি না বরং ভালো কাজের সহযোগিতা করছি। কোন প্রতিদান ছাড়া দায়িত্ব নিয়ে কষ্ট করে সকলের গোশত বণ্টন করে দিচ্ছি, যাতে হট্টগোল না হয়। যদি একত্রে কুরবানী না করা হয় তাহলে মানুষ অনুৎসাহিত হয়ে কুরবানী করতে চাইবে না। ফলে পশুর সংখ্যা কম হবে। আর তিন ভাগের দুই ভাগ না নিলে গরীবরা গোশত পাবে না। দুই ভাগ এজন্য নেওয়া হয় যাতে আলাদাভাবে আত্মীয়-স্বজনদের দিতে না হয়। কেননা সমাজের অংশ হিসেবে আত্মীয়রাও গোশত পেয়ে যাবে। আসল কথা হলো, মুরুব্বীরা বুঝেশুনেই এভাবে আমল করেছেন। সুতরাং আমরা তাদেরই অনুসরণ করছি। তারা কি ভুল করেছেন বা ভুল আমল করে গেছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে কিছু কুরবানীদাতার বক্তব্য হলো– 'আমরা সবাই মিলে একসাথে কুরবানী করি। একে অন্যের সহযোগিতা করি। আনন্দের সাথে সব কাজ সম্পাদন

করি। এতে সমস্যার কী আছে? গোশত একত্রে মেশানোর ফলে সমাজের সকলের কাছেই আমাদের গোশত পৌঁছে যাচ্ছে, যেটা এভাবে না করলে সম্ভব হতো না। মোটকথা, আমরা কম ঝামেলায় বেশি সওয়াব পাচ্ছি।'

অপরদিকে কিছু কুরবানীদাতার বক্তব্য হলো– 'শহর এলাকায় এবং অমুক অমুক এলাকায় কুরবানকেন্দ্রিক এ ধরণের রেওয়াজ নেই, কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। সুতরাং আমাদেরকে কেন বাধ্য করা হয়? তাছাড়া দুই তৃতীয়াংশ সমাজে দিতে হবে এটা কি হাদীসে আছে? আমাদের কুরবানী আমরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে দিবো এবং গোশত যাকে ইচ্ছা তাকে দিবো। কারণ, দুই ভাগ সমাজে রেখে আসলে বিশেষ আত্মীয়-স্বজনকে এবং যাদেরকে বেশি উপযুক্ত মনে হয়, তাদেরকে দিতে পারি না।'

আরেক শ্রেণীর বক্তব্য হলো– 'আমরা যদি স্বেচ্ছায় খুশি মনে এক-তৃতীয়াংশ সমাজের জন্য রেখে আসি আর তা যদি যারা কুরবানী করেনি শুধু তাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলে তো আর কোন সমস্যা থাকে না।'

আবার কেউ কেউ বলেন– 'আমরা যদি চাপ মনে না করে স্বেচ্ছায় আগের মতো আমল করি, তাতেও তো কোন সমস্যা নেই।'

এই পরিস্থিতিতে উল্লিখিত 'সমাজ ব্যবস্থা' সমাজপতি ও কুরবানীদাতাগণ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

উত্তর: প্রশ্নোল্লিখিত কুরবানীর গোশত বণ্টনের সামাজিক প্রথা একাধিক কারণে নাজায়েয। যথা–

১. কুরবানীর গোশত বণ্টন করার ক্ষেত্রে উত্তম হলো, প্রত্যেক কুরবানীদাতা তার অংশের গোশতকে তিন ভাগে ভাগ করবে। একভাগ নিজের জন্য, আরেক ভাগ আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, আর তৃতীয় ভাগ অসহায় গরীব-মিসকীনদের জন্য। আর এভাবে ভাগ ও বণ্টন করা কুরবানীদাতার জন্য মুস্তাহাব তথা ফযীলতপূর্ণ ঐচ্ছিক বিষয়; ফরয, ওয়াজিব তথা বাধ্যতামূলক নয়।

কুরবানীদাতা চাইলে নিজের জবাইকৃত পশুর গোশত পুরোটাই নিজের কাছে রেখে দিতে পারে, আবার কুরবানীদাতা ইচ্ছে করলে শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় হাদিয়া এবং সদকাও করতে পারে। এ ব্যাপারে শরীয়ত তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত হাদিয়া এবং সামাজিক প্রথায় কুরবানীদাতার শরীয়ত প্রদত্ত বণ্টনের স্বাধীনতাকে বাতিল করে নির্দিষ্ট একটি সিস্টেমে বাধ্য করা হয়। এভাবে একটি ঐচ্ছিক বিষয়কে আবশ্যকতার স্তরে নিয়ে এসে শরীয়তের রূপরেখা পরিবর্তনের দরুণ এই প্রথা নাজায়েয।

২. এই ধরনের সামাজিক বণ্টনে বড় একটি সমস্যা হলো, সমাজে গোশত দেওয়ার ক্ষেত্রে সকল কুরবানীদাতার সন্তুষ্টি থাকেনা বরং অনেকটা সামাজিকচাপে ও লোকলজ্জার ভয়ে সমাজপতিদের চাপিয়ে দেওয়া প্রথাটি মেনে নিতে বাধ্য হয়, আপনাদের প্রদত্ত প্রশ্নেও কিছু মানুষের অসন্তোষের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এই প্রক্রিয়া অন্যের সম্পদের তার সন্তুষ্টি ব্যতীত অবৈধ হস্তক্ষেপ করার শামিল, যা স্পষ্টভাবে হারাম। বাধ্য করে সংগৃহীত এমন গোশত ধনী-গরীব কারো জন্যেই হালাল নয়।

৩. সামাজিকভাবে জমাকৃত গোশতের মাঝে মান্নতের গোশতও থাকে, যা ধনী ও মান্নতকারীর জন্য খাওয়া নাজায়েয, অথচ উল্লিখিত সামাজিক বণ্টনের ক্ষেত্রে ধনী ও মান্নতকারীর মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য করা হয় না।

৪. অনেক সময় হারাম উপার্জন দ্বারা ক্রয়কৃত পশুর গোশতও অন্যান্য গোশতের সাথে একত্র করা হয়, যা খাওয়া কারো জন্যই জায়েয নয়।

৫. কুরবানীর গোশত বণ্টনে শরীয়তের একটি মুস্তাহাব বিধান হলো, একটি অংশ আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বিতরণ করা। অথচ সমাজপতিরা সামাজিকভাবে জমাকৃত গোশত নির্দিষ্ট একটি এলাকায় বিতরণ করার দ্বারা ঐ এলাকার বাইরে থাকা আত্মীয়-স্বজনরা নিজেদের কুরবানীদাতা আত্মীয়ের হিসসা থেকে বঞ্চিত হয়।

উল্লিখিত এসব শরীয়তবিরোধী নাজায়েয বিষয়াদির কারণে কুরবানীর গোশত বণ্টনের প্রচলিত সামাজিক প্রথাটি নাজায়েয ও বিদ'আত। এই কাজে লিপ্ত সমাজপতি, কুরবানীদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই গুনাহগার হবে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, এই নাজায়েয প্রথা বর্জন করে কুরবানীর গোশত বণ্টনের প্রক্রিয়া কুরবানীদাতার ইচ্ছাধীন ছেড়ে দেওয়া।

হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে, সমাজপতিদের পক্ষ হতে কুরবানীদাতাদের গোশত প্রদানের কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হবে না এবং কেউ না দিলেও তাকে বাধ্য করা হবে না; বরং স্বেচ্ছায় যে যতোটুকু দেয় সেটুকুই সমাজের শুধু গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে তাহলে এতে কোন আপত্তি নেই। (সূরা হজ্জ-২৮, ৩৬, আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী; হাদীস ১১৫৪৫, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৮, বাদায়িউস সানায়ে ৬/৩২৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৯১)

মুহাম্মদুল্লাহ
নুরজাহান রোড, মুহাম্মদপুর।

৪৩৬ প্রশ্ন: একব্যক্তি কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করেছে। একভাগ আত্মীয়-স্বজনদের নিকট পৌঁছানোর জন্য একব্যক্তির মাধ্যমে বাসে করে পাঠিয়ে দেয়। ঘটনাক্রমে বাসের মধ্যে গোশতের প্যাকেটটি হারিয়ে যায়। সেই ব্যক্তি ড্রাইভারের কাছে গোশতের দাবী করলে ড্রাইভার তাকে একহাজার টাকা দেয়। জানার বিষয় হলো, হারানো গোশতের জরিমানাস্বরূপ আদায়কৃত এই একহাজার টাকার বিধান কী?

উত্তর: উক্ত একহাজার টাকা কুরবানীদাতা নিজে ব্যবহার করতে পারবে না; বরং কোন গরীব-মিসকীন বা মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ডে সদকা করে দিতে হবে। (হিদায়া ৪/৩৬০, ইনায়া ৯/৫১৮, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪৪০, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যাহ ২২/৪৭১, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৬/৩৬৪)

এমদাদুল হক
গুলশান, ঢাকা

৪৩৭ প্রশ্ন: কুরবানীর গোশত গরীব-মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনকে না দিয়ে কুরবানীদাতা কি একাই ভোগ করতে পারবে?

উত্তর: কুরবানীর গোশত তিন ভাগে ভাগ করে একভাগ নিজে রাখা, একভাগ

আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়া আর একভাগ গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব বা উত্তম। সুতরাং কেউ যদি উক্ত পদ্ধতিতে তিন ভাগ না করে নিজেরাই সব খেয়ে নেয় তাহলে তা উত্তম না হলেও কোন গুনাহ নেই। তবে মুস্তাহাব পদ্ধতি অনুযায়ী বণ্টন করা বরকত ও সৌভাগ্যের ব্যাপার। সুতরাং সে অনুযায়ী করাটাই উত্তম। (ফাতাওয়া শামী ৬/২২৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০, বাদায়িউস সানায়ে ৫/৮১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৪/৩১১)

রফিকুল ইসলাম
যশোর

৪৩৮ প্রশ্ন: আমাদের এলাকার কিছু লোকের বক্তব্য হলো, কুরবানীর চামড়া মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ডে দেওয়া যাবে না; বরং এলাকার গরীব মিসকীনদের দিতে হবে। এ ব্যাপারে সঠিক মাসআলা জানতে চাই।

উত্তর: কুরবানীর চামড়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো– কুরবানীর চামড়া কুরবানীদাতা নিজে জায়নামায, দস্তরখান, পানির মশক ইত্যাদি বানিয়ে ব্যবহার করতে পারবে, এমনকি সরাসরি চামড়াটি কাউকে হাদিয়াও দিতে পারবে। তবে চামড়া যদি বিক্রি করা হয় তাহলে তার মূল্য গরীব-মিসকীনদেরকে সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। আর সদকা তারাই গ্রহণ করতে পারবে যারা যাকাত গ্রহণ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে চামড়া বিক্রিত মূল্য নিজের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা গরীব তাদেরকে যেমন দিতে পারে, তেমনিভাবে যে সমস্ত মাদরাসায় লিল্লাহ বোর্ডিং আছে– যেখান থেকে গরীব তালিবে ইলমদের খানা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়– সেখানেও দিতে পারে। তবে সাধারণ গরীব-মিসকীনকে দেওয়ার চেয়ে গরীব তালিবে ইলমদের জন্য মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ডে দেওয়া অধিক সাওয়াবের কাজ। কারণ এতে একদিকে সদকার সওয়াব পাওয়া যায় অন্যদিকে তালিবে ইলমদের খিদমত করার সদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২৭৩ নং আয়াতে দীনী কাজে আবদ্ধ গরীবদেরকে দান করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন–

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

অর্থ: (আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে) উপযুক্ত সেই সকল গরীব, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর পথে এভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে যে, (অর্থের সন্ধানে) তারা ভূমিতে চলাফেরা করতে পারে না। তারা যেহেতু (অতি সংযমী হওয়ার কারণে কারও কাছে) সওয়াল করে না, তাই অনবগত লোকে তাদেরকে বিত্তবান মনে করে। তোমরা তাদের চেহারার আলামত দ্বারা তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা) চিনতে পারবে। (কিন্তু) তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে সওয়াল করে না। তোমরা যে সম্পদই ব্যয় করো, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

সুতরাং যারা বলে কুরবানীর চামড়া বা তার মূল্য মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ডে দেয়া যাবে না; শুধু গরীব-আত্মীয়দেরকেই দিতে হবে, তাদের কথা ভুল এবং কুরআনে পাকের উল্লিখিত আয়াতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

উল্লেখ্য, কুরবানীর চামড়ার মূল্য মসজি-মাদরাসার নির্মাণখাতে এমনিভাবে কোন সেবাসংস্থার সেবা-খাতে কিংবা মাদরাসা-মসজিদের স্টাফদের বেতনখাতে দেয়া যাবে না। (সূরা তাওবা-৬৬, হিদায়া ৪/৪৫০, আদ-দুররুল মুখতার ৬/৩২৮, ২/৩৩৯, বিনায়াহ ১১/৬৩, মাজমূউল আনহুর ৪/১৭৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৭২, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/১৬৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫৩১)

রাশেদুল ইসলাম
বাড্ডা

৪৩৯ প্রশ্ন: মাদরাসার পক্ষ হতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কুরবানীর পশুর চামড়া ক্রয় করা হয়। অতঃপর ক্রয়কৃত চামড়াগুলোর এলাকাভিত্তিক একটা মূল্য নির্ধারণ করা হয়। তারপর চামড়াগুলো কোন ট্যানারীতে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হয়। জানার বিষয় হল, ট্যানারীর কাছে বিক্রয়ের লভ্যাংশ দ্বারা মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দেয়া কি জায়েয হবে?

উত্তর: মাদরাসার সাধারণ ফান্ড থেকে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ অন্যান্য চামড়া ব্যবসায়ীদের ন্যায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে কুরবানীর পশুর চামড়া এলাকাভিত্তিক ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করে তা অন্যত্র কোন ট্যানারীর কাছে বিক্রি করার পর যে লভ্যাংশ অর্জিত হবে তা দ্বারা উস্তাদদের বেতন-ভাতাসহ মাদরাসার যাবতীয় কল্যাণে যে কোন কাজে ব্যয় করতে পারবে। এটা সাধারণ ব্যবসার লভ্যাংশের মতো গণ্য হবে। আর চামড়া যদি এলাকাভিত্তিক ন্যায্য মূল্যে ক্রয় না করে থাকে বরং মাদরাসার খাতিরে বিক্রেতা স্বল্প মূল্যে দিয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তা বিক্রি করার পর তাদের ক্রয়কৃত মূল্যের সমপরিমাণ রাখার পর অবশিষ্ট লভ্যাংশ উপযুক্ত গরীবদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে। আর মাদরাসায় লিল্লাহ ফান্ড থাকলে সেখানেও জমা করতে পারে। পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষ যদি মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ড থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কুরবানীর পশুর চামড়া ক্রয় করে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে পূর্ণ অর্থের হকদার একমাত্র মাদরাসার উপযুক্ত গরীব ছাত্ররাই হবে। একান্ত প্রয়োজনেও সহীহ তাবীল ছাড়া অন্য কোন খাতে ব্যয় করা বৈধ হবে না। (কানযুল উম্মাল; হাদীস ৯৩৪২, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫৩০, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৮, হিদায়া ১/৪৫০)

রাকিব হাসান
টাঙ্গাইল

৪৪০ প্রশ্ন: কারো কাছ থেকে কুরবানী বা আকীকার চামড়ার আংশিক বা পূর্ণমূল্য হারিয়ে গেলে কি উক্ত টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে?

উত্তর: যদি গরীবকে দেওয়ার পূর্বেই কারো কাছ থেকে কুরবানীর চামড়ার মূল্য আংশিক বা সম্পূর্ণটুকু হারিয়ে যায় তাহলে ঐ পরিমাণ টাকা গরীব-মিসকীনদেরকে সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। আর আকীকার চামড়ার মূল্য হারিয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব নয় তবে দেওয়া উত্তম। (ই'লাউস সুনান ১৭/১২০, আদ-দুররুল মুখতার ৬/৩২৮, হিদায়া ৪/৪৫০, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৬-৩৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/৩৩২, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৪৮৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৬১০, কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৩৮)